পথ বেঁধে দিল

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দুই টাকা আট আনা

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৮

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫২

তৃতীয় সংস্করণ—১৩৫৯

উৎসর্গ

অকুতোভয় সাহিত্যবীর, মদক্ষরিতগণ্ড কাব্য-দিঙ্‌নাগ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

অকৃত্রিমসুহৃদয়েষু

ভাই বলাই,

তোমার প্রতিভা, তোমার সৃষ্ট কোকিল হাতি গণ্ডার ও মাকড়সা'র মত স্পেশালাইজেশন স্বীকার করে না, সাহিত্য-মহীরুহে সকল শাখা-প্রশাখাতে তাহার অবাধ গতিবিধি। তাই এই ক্ষুদ্র নূতন শাখাটি তোমাকে উৎসর্গ করিলাম; ভরসা করি অচিরাৎ ইহাতে আরোহণ করিয়া তুমি আমাদের নয়নরঞ্জন করিবে।

মালাড্‌—বম্বে
চৈত্র ১৩৪৭

তোমার প্রীতি ও প্রতিভামুগ্ধ বন্ধু
শরদিন্দু

গল্পের সমস্ত ঘটনা একই কালে বা একই স্থানে ঘটে না। লিখিত গল্পে দু-একটি কথার দ্বারা স্থানকালের পরিবর্ত্তন দেখানো যায়। নাটকে অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের ব্যবস্থা আছে। চিত্রনাট্যে উক্ত স্থানকালের পরিবর্ত্তন নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায়ে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই চিত্রনাট্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম নির্দ্দেশগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষজ্ঞের নিকট যে-সকল নির্দ্দেশ প্রয়োজনীয়, গল্পের রস-পিপাসু সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা ক্লান্তিকর বোধ হইতে পারে; তাই মোটামুটি চিত্রনাট্যের ছাঁচ বজায় রাখিয়া গল্প বলার চেষ্টা হইয়াছে। তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলে অলিখিত নির্দ্দেশগুলি অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

ফেড্ ইন্—ফেড্ আউট্: একটি দৃশ্য মিলাইয়া যাইবার পর অন্য দৃশ্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে। ইহার দ্বারা স্থানকালপাত্র সকল রকম পরিবর্ত্তন বুঝানো যাইতে পারে।

ডিজল্ভ্: এক দৃশ্য সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অন্য দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ইহার দ্বারা সময়ের পরিবর্ত্তন সূচিত হয়; যে ঘটনা আগে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা দেখানো যায়; চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনার বস্তু প্রভৃতি চাক্ষুষ করানো যায়।

ওয়াইপ্: সংক্ষিপ্ত ডিজল্ভ্। দুইটি ঘটনার মধ্যবর্ত্তী অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যথা—নায়ক বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে চড়িল—ওয়াইপ্—নায়ক বিলাতে পৌঁছিল।

কাট্: প্রধানত স্থান পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে। ধারাবাহিক ঘটনা বিভিন্ন স্থান দেখাইতে হইলে অথবা একই দৃশ্যের ভিন্ন অংশ দেখাইতে হইলে ইহার প্রয়োজন।

পথ বেঁধে দিল

ফেড্ ইন্।

বঙ্গদেশ ও সাঁওতাল পরগণার মাঝামাঝি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের এক অংশ। পথ নির্জ্জন; কেবল একটিমাত্র মোটর সাইকলের আরোহী প্রচণ্ড বেগে সাইক্‌ল্ চালাইয়া যাইতেছে।

মোটর সাইক্‌লের আরোহী সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান এক যুবা—তাহার নাম রঞ্জনপ্রকাশ সিংহ। সে মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। মোটর সাইক্‌লের আওয়াজে তাহার গানের কথাগুলা কিন্তু ভাল ধরা যাইতেছে না।

এইভাবে চলিতে চলিতে রাস্তার পাশে একটি সাইন-পোস্ট যুবকের দৃষ্টিগোচর হইল। সে গাড়ীর গতি হ্রাস করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

মোটর সাইক্‌ল্ সাইন-পোস্টের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন গাড়ী হইতে না নামিয়া সাইন-পোস্টের লেখা পড়িল—

"ঝাঝা—১৭৫ মাইল"

রঞ্জন : ঝাঝা—১৭৫ মাইল। বেশ কথা···

রঞ্জন শিষ্টতাসহকারে সাইন-বোর্ডের দিকে ঘাড় নাড়িল; সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল; তারপর সাইন-পোস্টের দিকে চক্ষু বাঁকাইয়া অর্দ্ধস্ফুট একটি 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। মোটরের ফট্ ফট্ শব্দের সহিত গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

ডিজল্ভ্।

কলিকাতা শহর।

একটি বড় দোকানের দরজার মাথায় প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড টাঙানো রহিয়াছে—

'বৃহৎ দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা'
স্বত্বাধিকারী : শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ

দোকানের প্রশস্ত দ্বার কাচ-নির্ম্মিত। এই পথে ক্রমাগত বহু ক্রেতা প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে। কাহারও কাহারও চোয়াল ও মাথা ঘিরিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; তাহা হইতে অনুমান হয় ইহারা দন্তশূলের রোগী। যাহারা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাদের সকলের হাতেই সদ্য-ক্রীত ঔষধের শিশি।

দোকানের অভ্যন্তর।

একটি বড় ঘর। প্রত্যেক দেয়াল বহু ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঔষধের

আলমারি দিয়া ঢাকা। ঘরের মাঝখান দিয়া উঁচু কাউণ্টার এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে। কাউণ্টারের এক দিকে ক্রেতারা, অপর দিকে দোকানের কর্ম্মচারিগণ। দ্রুত কাজ চলিতেছে; কর্ম্মচারিগণ ঔষধ কাগজে মুড়িয়া দিতেছে, টাকা লইতেছে; ক্যাস্ মেমো কাটিতেছে। একটা সমবেত গুঞ্জন শব্দ মৌমাছিপূর্ণ মৌচাকের কর্ম্মতৎপরতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কাউণ্টারের ঠিক মধ্যস্থলে স্বত্বাধিকারী প্রতাপবাবু একটি উঁচু চেয়ারে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে কাউণ্টারের উপর মোটা মোটা কয়েকটি খাতা কাগজ কলম প্রভৃতি রহিয়াছে। প্রতাপবাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। তাঁহার বাম গণ্ডে সুপারির আকারের একটি আব্ আছে। তিনি যে একজন পাকা ও হুঁসিয়ার ব্যবসাদার, তাহা তাঁহার চোখের সতর্ক দৃষ্টি হইতে পরিস্ফুট। তাঁহার চোখ দোকানের চারিদিকে ঘুরিতেছে; অথচ তিনি অমায়িকভাবে বন্ধু বিধুবাবুর সহিত গল্প করিতেছেন।

বিধুবাবু কাউণ্টারের বাহিরের দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি প্রতাপবাবুর মত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক; একজোড়া ভিজা-বিড়াল জাতীয় গোঁফ্ আছে। তিনি সামাজিক জীব, অত্যাধুনিক সমাজে তাঁহার গতিবিধি আছে। এখানকার কথা ওখানে চালাচালি করা এবং নিজে নির্লিপ্তভাবে মজা দেখাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

বিধুবাবু ও প্রতাপবাবুতে কথা হইতেছে। বিধু সপ্রশংস নেত্রে প্রতাপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

বিধু : বাস্তবিক তোমাকে দেখলে আনন্দ হয়। এই দাঁতের ওষুধ তৈরি ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছ, কিন্তু এখনও রোজ দোকানে এসে বসা চাই...

প্রতাপ একটু গাম্ভারিভাবে হাসিলেন।

প্রতাপ : ভায়া, নিজে না দেখলে ব্যবসা চলে না—সব ব্যাটা চোর। বুঝলে ?

বিধু : যাই বল, এবার কিন্তু তোমার বিশ্রাম করা দরকার। আর কি, ছেলে লেখাপড়া শেষ করল, এবার তার হাতে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ীতে বসে আরাম কর।

প্রতাপের মুখচোখের ভাব একটু কড়া আকার ধারণ করিল।

প্রতাপ : হুঃ—আরাম করব !

এই সময় একটি কেরানী কয়েকটি কাগজপত্র লইয়া প্রবেশ করিল ও সেগুলি প্রতাপের সম্মুখে স্থাপন করিল। প্রতাপ সেগুলির উপর চোখ বুলাইয়া দস্তখৎ করিলেন। কেরানী কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেল।

বিধু এইবার কথা কহিলেন।

বিধু : (ঈষৎ বিস্ময়ে) কিন্তু তোমার রঞ্জন তো খুব ভাল ছেলে ! সমাজে সকলের মুখেই তার সুখ্যাতি শুনতে পাই। সবাই বলে অমন ছেলে হয় না !

প্রতাপ : (সক্ষোভে) আরে, ভাল ছেলে হয়েই তো হয়েছে বিপদ। তাকে কলকাতা থেকে একেবারে বাইরে পাচার ক'রে দিয়েছি।

বিধু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন।

বিধু: বল কি! কেন হে?

প্রতাপ: কেন আবার! তুমি তো সবই জানো।...(গলা খাটো করিয়া) আমাদের সমাজে যত—এই—প্রবীণা ভদ্রমহিলা আছেন না?—সকলের নজর আমার ছেলেটির ওপর। সবাই চান, কোনও ফিকিরে আমার ছেলেটিকে ফাঁসিয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। তার ওপর, এখন ছেলে আমার এম্, এস্-সি পাশ করেছে—এখন তো কি বলে ভদ্রমহিলারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাই মন্থে মন্থে ছেলেটিকে...

আঙুলে তুড়ি দিয়া প্রতাপ এমন একটি হস্তভঙ্গী করিলেন যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি পুত্রকে বহুদূরে প্রেরণ করিয়াছেন। বিধু হাস্য গোপনের চেষ্টায় মুখ বিকৃত করিয়া গালের উপর হাত রাখিলেন; প্রকাশ্যে হাসিয়া ফেলিলে হয় তো প্রতাপ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। প্রতাপ কিন্তু তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করিলেন।

প্রতাপ: কি হে, তোমারও আবার দন্তশূল চাগাড় দিল না কি? (পকেটে হাত দিয়া) ভেবো না, আমার পকেটেই দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা আছে—এই নাও, খেয়ে ফ্যালো—দু' মিনিটে আরাম হয়ে যাবে।

তিনি বড়ি বাহির করিয়া ধরিলেন। বিধু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বিধু: না, না, দন্তশূল নয়। বলছিলুম কি যে, ছেলের

বিয়ে তো তোমাকে দিতেই হবে—তা, সমাজেরই একটি ভাল মেয়ে দেখেশুনে—

প্রতাপ বড়ি পুনশ্চ পকেটে পুরিলেন ; তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন।

প্রতাপ : হুঃ—আমি একটা হাড়হাবাতে ফাজিল বেহায়া মেয়ে বৌ ক'রে ঘরে আনব ? আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে, আমি রাজার ঘরে তার সম্বন্ধ ঠিক করছি।

বিধু পুলকিত আগ্রহে কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন।

বিধু : ও—তাই। বুঝেছি। তা, সে জন্যে ছেলেকে একেবারে দেশান্তরী করবার কি দরকার ছিল ?

প্রতাপ সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ খাটো গলায় জবাব দিলেন।

প্রতাপ : তুমি বোঝো না বিধু। আজকালকার নয়া আমলের ছোঁড়ারা একটু ফর্সা-গোছ মেয়ে দেখেছে কি পট ক'রে প্রেমে পড়ে গেছে। আমার রঞ্জন অবশ্য তেমন নয়—কিন্তু বলা তো যায় না। এখন ধর, আমার ছেলেটি একদিন এসে যদি বলে—'বাবা, আমি অমুক কলেজের কুমারী অমুককে ভালবেসে ফেলেছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'—তখন আমি কি করব ? তাই এই মৎলব করেছি, বাবাজীকে একেবারে পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপর এদিকে সব ঠিকঠাক ক'রে একদিন নিজে গিয়ে বাবাজীকে নিয়ে আসব। ব্যস্।

বিধু হাসিতে হাসিতে বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন।

বিধু : মন্দ ফন্দি আঁটো নি। তা, ছেলেকে পাঠালে কোথায় ?

প্রতাপ: (সগর্ব্বে) এমন জায়গায় পাঠিয়েছি যেখানে কোনও ভদ্রমহিলা নাগাল পাচ্ছেন না। ঝাঝাতে নতুন বাড়ী কিনেছি জানো তো?

প্রতাপ মস্তক সঞ্চালন ও চক্ষের ভঙ্গী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে ছেলেকে তিনি সেইখানেই পাঠাইয়াছেন। বিধু সংবাদটি পরিপাক করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, তারপর ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বিধু: বেশ বেশ। আজ চল্‌লুম ভাই—

বিধু প্রস্থানোদ্যত হইলে প্রতাপ সহসা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ: ওহে বিধু! দেখো, তোমাকে চুপি চুপি বললুম কথাটা যেন চাউর হয়ে না পড়ে—

বিধু: আরে না না, পাগল নাকি?

বিধু প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত সংশয়ের ভাব মুখে ফুটাইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ডিজল্‌ভ্‌।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়া রঞ্জন মোটর সাইক্লে চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে ঋজু নির্জ্জন পথ পড়িয়া আছে।

কাট্‌।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের অন্য অংশ। রাস্তার একপাশে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে আরোহী কেহ নাই।

গাড়ীর আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায়, গাড়ীর তলা হইতে দুটি পা বাহির হইয়া আছে, যেন কেহ গাড়ীর তলায় ঢুকিয়া গাড়ী মেরামত করিতেছে। পা দুটি আকারে ক্ষুদ্র ও জুতা বর্জ্জিত।

দূরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গেল। তারপর দেখা গেল রঞ্জন এইদিকেই আসিতেছে।

রঞ্জনের বাইক ঠিক মোটরকারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন তদবস্থায় গাড়ীর মধ্যে উঁকি মারিল।

রঞ্জন : আরে! বিলকুল ফাঁকা—ওঃ!

নীচের দিকে নজর পড়িতে সে পা দুটি দেখিতে পাইল। বাইক হইতে নামিয়া সে পদদ্বয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; কোমরে হাত রাখিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া বলিল—

রঞ্জন : ওহে ছোকরা! কি হয়েছে তোমার কারের? বেরিয়ে এসো।

কারের তলা হইতে কোনও জবাব আসিল না। তখন রঞ্জন নত হইয়া পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল। পায়ের আঙুল কুঁকড়াইয়া যতই সরিয়া যাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল, রঞ্জন ততই আমোদ বোধ করিয়া সুড়সুড়ি দিতে লাগিল।

অবশেষে পায়ের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল গাড়ীর নীচের লোকটি বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। রঞ্জন তখন একটু দূরে সরিয়া গিয়া সকৌতুকে এই নিষ্ক্রমণক্রিয়া দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে তাহার সহাস্য মুখের ভাব বদলাইয়া গেল;

কৌতুকের পরিবর্ত্তে একটা বোকাটে বিস্ময়ের ভাব তাহার চক্ষু ও অধরকে সুবর্ত্তুল করিয়া দিল।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখা গেল, যিনি গাড়ীর তলা হইতে বাহির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছেন তিনি যুবতী। তাঁহার চেহারা অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু সম্প্রতি কালিমাখা এক ফোঁটা চর্ব্বির দাগ তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার বুক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত একটি ক্যাম্বিসের ওভার-অল্ দ্বারা আবৃত। দক্ষিণ হস্তে একটি স্প্যানার, দুই চক্ষে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ মানসিক উষ্ণতার পরিমাপ ঘোষণা করিতেছে।

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জনের মুখোমুখি দাঁড়াইলেন; হাতের স্প্যানার দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া চাপা ক্রোধের স্বরে কথা কহিলেন—

যুবতী : কে আপনি?

রঞ্জন যুবতীর মুখ হইতে স্প্যানারের দিকে তাকাইয়া এক পা পিছু হটিল; তারপর কোণাচে-ভাবে নিজের বাইকের দিকে আগাইতে লাগিল। যুবতীর দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিল। নিজের গাড়ীর উপর চাপিয়া বসিয়া রঞ্জন ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল; যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নিভাবে কহিল—

রঞ্জন : আমি! কেউ না—মানে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—

যুবতী আরও দুই পা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ চোখের ভঙ্গীতে অহিংসা-নীতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইল না।

যুবতী : আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিলেন কেন?

শান্তিকামী রঞ্জন ডান হাত নাড়িয়া ব্যাপারটাকে সহজতার পর্য্যায়ে আনিবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জন : মানে—আমার কোনও ইয়ে ছিল না। আমি পা দেখে ভেবেছিলুম আপনি পুরুষমানুষ—অর্থাৎ কি-না—ছেলে-মানুষ—অর্থাৎ—

কথার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার হস্তভঙ্গী করিয়া রঞ্জন বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে সে যুবতীটিকে কিশোরবয়স্ক বালক বলিয়া ভুল করিয়াছিল।

যুবতীর মুখমণ্ডলের দৃপ্ত অরুণিমা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল; তিনি নিজের নগ্ন পদদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি অবনত করিলেন।

যুবতী : ওঃ—

ফিরিয়া গিয়া তিনি নিজের গাড়ীর ভিতব হইতে একজোড়া স্লিপার বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। হাতের স্প্যানার ফেলিয়া দিয়া গাড়ীর ফুট-বোর্ডের উপর উপবেশন করিলেন। তারপর করতলে কপোল রাখিয়া এমনভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন চক্ষু দ্বারা তাহাকে যাচাই করিতেছেন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করিলেও রঞ্জন যুবতীটির সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিল। সে উঠিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিতে করিতে যুবতীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া রুমালটি তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—

রঞ্জন : ইয়ে—আপনার গালে—একটু কালি-ঝুলি—মুছে ফেলুন—

যুবতী সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজ দক্ষিণ গণ্ডে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিতে কালির দাগ দেখিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। অস্ফুট আক্ষেপোক্তি করিয়া তিনি নিজের গাড়ীর ভিতর হইতে রুমাল ও ভ্যানিটি কেস্ বাহির করিয়া ক্ষুদ্র আয়নায় নিজের মুখ দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে নিরতিশয় ক্ষুব্ধভাবে রঞ্জনের প্রতি একটা কটাক্ষ হানিয়া তিনি গালে রুমাল ঘষিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রঞ্জন সদ্ভাব আরও ঘনীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল।

রঞ্জন: কি হয়েছে বলুন তো আপনার গাড়ীর? মোটর সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানি—যদি ইঞ্জিনের কোনও গোলমাল হয়ে থাকে—অথবা—মোট কথা, সব মোটরের নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা আছে—মেরামৎ করতেও জানি—

যুবতীটি রঞ্জনের দিকে পাশ ফিরিয়া গালে রুমাল ঘষিতেছিলেন, এখন ক্ষণেকের জন্য ঘাড় ফিরাইয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—

যুবতী: আমিও জানি।

এই বলিয়া যুবতী আবার আয়নার মধ্যে চাহিয়া গণ্ডে রুমাল ঘষিতে লাগিলেন।

যুবতীর কথা বলার ভঙ্গী হইতে বিশেষ উৎসাহ না পাইলেও রঞ্জন হাল ছাড়িল না।

রঞ্জন: হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তবে কি-না—আপনি মহিলা—

যুবতী এতক্ষণে গণ্ডের কলঙ্ক মোচন শেষ করিয়াছেন। এবার অত্যন্ত নিঃসংশয়ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

যুবতী : মহিলা হ'লেও আমি নিজের কাজ্ নিজে করতে পারি। আপনার সাহায্যের দরকার নেই।

রঞ্জন মুষ্ড়িয়া গেল; একটু রাগও হইল। স্কন্ধদ্বয়ের একটি নিরুপায়সূচক ভঙ্গী করিয়া সে নিজের মোটর বাইকের কাছে ফিরিয়া গেল; তারপর বাইকের আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিয়া গম্ভীর চোখে যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করায় সে যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা তাহার মুখভাব হইতে বুঝা যায়। ক্ষমতা থাকিলে সে চলিয়া যাইত, কিন্তু যুবতীটির এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে—

যুবতীটি আবার গাড়ীর ফুটবোর্ডে বসিয়াছেন এবং পূর্ব্ববৎ করলগ্নকপোলে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তিনি নির্লিপ্তভাবে কথা কহিলেন।

যুবতী : আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল। যুবতী যে যাচিয়া তাহার সহিত কথা কহিবেন তাহা সে প্রত্যাশাই করে নাই; হাস্যবিস্মিত মুখে সাগ্রহে উত্তর দিল—

রঞ্জন : আমি ? আমি ঝাঝায় যাচ্ছি। ঐ যে—ঝাঝা—

হস্ত প্রসারিত করিয়া সে ঝাঝার দিকটা দেখাইয়া দিল, যেন ঘাড় ফিরাইলেই ঝাঝা দেখা যাইবে।

যুবতীটি কিন্তু তীক্ষ্ণ জবাব দিলেন; তাঁহার বিনীত স্বরের ভিতর হইতে তীব্র শ্লেষ ফুটিয়া উঠিল।

যুবতী : তবে যাচ্ছেন না কেন?

রঞ্জন হতভম্ব হইয়া গেল। নিরীহ প্রজাপতি যদি হঠাৎ বোলতার মত হুল ফুটাইয়া দেয় তাহা হইলে বোধ করি মানুষের মুখের ভাব এমনই হয়। ক্রমে সে রাগিয়া উঠিল। যুবতীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া নিজের গাড়ীর উপর সোজা হইয়া বসিল; গাড়ীর যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিয়া স্টার্ট দিতে গিয়া শেষে কি ভাবিয়া আবার আগের মত আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিল। বিদ্রোহীর মত বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া যেন আকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

রঞ্জন : আমার ইচ্ছে আমি যাব না—সরকারী রাস্তা—

যুবতী নয়ন হইতে রঞ্জনের প্রতি একটি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন; তারপর অপরিসীম অবজ্ঞায় চিবুক ও নাসিকা উন্নত করিয়া পুনরায় গাড়ীর তলায় প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

রঞ্জন ভ্রূবদ্ধ ললাটে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

কিছুক্ষণ সময় কাটিয়াছে। রঞ্জন পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে। সিগারেটের শেষাংশটুকু ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়া-মোড়া ভাঙিল।

মোটরের নীচে হইতে ঠুংঠাং মেরামতির আওয়াজ আসিতেছে। রঞ্জন অলসপদে মোটরখানাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; খোলা বনেটের ভিতর দিয়া ইঞ্জিনের ভিতর উঁকি মারিল; তারপর

পশ্চাদ্দিকে গিয়া যেখানে পেট্রোল ট্যাঙ্ক আছে সেইখানে দাঁড়াইল। একটু ইতস্তত করিয়া নিঃশব্দে পেট্রোল ট্যাঙ্কের মুখ খুলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। শেষে পূর্ব্ববৎ নির্লিপ্তভাবে একটি গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার মুখের মেঘ আর নাই।

ডিজল্ভ্।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। রাস্তার এক স্থানে অনেকগুলা সিগারেটের টুক্‌রা পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটা হইতে এখনও ধুঁয়া বাহির হইতেছে। রঞ্জন পায়ে তাল দিতে দিতে একটি গান গাহিতেছে। তালমান শুদ্ধ হইলেও গানের বিষয়বস্তু অতিশয় লঘু।

রঞ্জন : "এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভাল
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো—"

রঞ্জন আকাশের দিকে চাহিয়া নিজমনেই গান গাহিতেছে ; যদিও তাহার দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া চকিতের ন্যায় মোটরের তলাটা ঘুরিয়া আসিতেছে।

রঞ্জন : সেই দেশেতে বেরাল পালায় নেংটি ইঁদুর দেখে
ছেলেরা খায় ক্যাস্টরয়েল রসগোল্লা রেখে।"

তৃতীয় চরণ গাহিতে আরম্ভ করিয়া রঞ্জন থামিয়া গেল ; যুবতী গাড়ীর তলা হইতে আবার বাহির হইয়া আসিতেছেন।

বাহির হইবার পর তিনি ক্রোধ-ক্ষোভ-ব্যর্থতা-লজ্জা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রঞ্জনকে অভিসিঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মোটরের চালকের আসনে প্রবেশ করিয়া গাড়ী স্টার্ট দিবার চেষ্টা করিলেন। গাড়ী কিন্তু চলিল না, কেবল তাহার পেটের মধ্যে ভট্-ভাট্ শব্দ হইতে লাগিল। যুবতী তখন গাড়ীর স্টীয়ারিং হুইলে একটা হিংস্র মোচড় দিয়া বাহিরে ফুট-বোর্ডে আসিয়া বসিলেন।

রঞ্জন সিগারেট কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট বাহির করিল, অতি যত্নে সেটি ধরাইয়া একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ করিল; তারপর যুবতীর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন : হ'ল না মেরামত ?

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত যুবতী জ্বলিয়া উঠিলেন।

যুবতী : না! কিন্তু তাতে আপনার কি ?

রঞ্জন নির্ব্বিকার। পুনশ্চ সিগারেট হইতে অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া সে সিগারেটের জ্বলন্ত প্রান্তের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

রঞ্জন : গাড়ীর কি হয়েছে আমি জানি—

যুবতীর চক্ষে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল; তিনি সপ্রশ্নভাবে রঞ্জনের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। রঞ্জন তেমনি অন্যমনস্ক-ভাবে তাহার কথা শেষ করিল—

রঞ্জন : পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে।

যুবতী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিলেন; তারপর দ্রুত উঠিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্দিকে অনুসন্ধান করিতে গেলেন।

রঞ্জন আড়চোখে চাহিয়া একটু বিজয়হাস্য করিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব গোপন করিয়া নির্লিপ্ত মুখে সিগারেটে টান দিল।

যুবতী পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকা খুলিয়া তাহার মধ্যে একটি কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কাঠিটি টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন উহা সম্পূর্ণ শুষ্ক। ধীরে ধীরে তাঁহার গণ্ডদ্বয় লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া মোটরের গায়ে হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন ; রঞ্জনের মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাইতে পারিলেন না।

রঞ্জন সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ফেলিয়া দিয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল ; হাই তুলিয়া তুড়ি দিল ; তারপর নিজের গাড়ীর উপর সোজা হইয়া বসিয়া পিছন দিকে তাকাইয়া বিদায়-জ্ঞাপক হাত নাড়িল।

রঞ্জন : আচ্ছা চললুম্—নমস্কার।

সে গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

যুবতী অসহায় ক্ষোভে অধর দংশন করিলেন। এদিকে রঞ্জন চলিয়া যায়, তাহার গাড়ী নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দর্প বিসর্জ্জন দিয়া শেষে যুবতী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন—

যুবতী : শুনুন !

রঞ্জন বোধ করি এই আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছিল ; গাড়ী থামাইয়া যুবতীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরস শিষ্টতার কণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন : আপনি ডাকছিলেন ?

লজ্জায় যুবতীর মাথা কাটা যাইতেছিল ; তবু তিনি ঢোক গিলিয়া কোনও ক্রমে বলিলেন—

যুবতী : আমি—আমি—আপনার কাছে পেট্রোল আছে ?

রঞ্জন : (নিরুৎসুক ভাবে) আছে।

যুবতী পুনরায় অধর দংশন করিলেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই ; মনের বিদ্রোহ দমন করিয়া বলিলেন—

যুবতী : তা হ'লে—যদি—আমাকে দেন—

রঞ্জন ঈষৎ বিস্ময়ে যুবতীর দিকে তাকাইল।

রঞ্জন : আমার পেট্রোল আপনাকে দেব ! তারপর ? আমি কি এখানে বসে বসে হাপু গাইব ?

যুবতীর চক্ষু ফাটিয়া প্রায় জল আসিয়া পড়িল। তিনি কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

যুবতী : আমিও ঝাঝা যাচ্ছি—আপনি আমার গাড়ীতে আসতে পারেন।

রঞ্জন : ও—আপনিও ঝাঝা যাচ্ছিলেন ?

মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিলেও রঞ্জন বাহিরে যুবতীর প্রস্তাব বিবেচনা করার ভঙ্গীতে বলিল—

রঞ্জন : বুঝেছি। আপনি ঝাঝা যাচ্ছেন—

যুবতী : হ্যাঁ—আমরা ঝাঝাতেই থাকি—আমার বাবার ওখানে অভ্রের খনি আছে।

রঞ্জন : ও—

যুবতী : বাবা ঝাঝাতেই থাকেন—আমি—

রঞ্জন : আপনি কলকাতায় !

যুবতী : হ্যাঁ। হঠাৎ বাবার অসুখের 'তার' পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি—

রঞ্জন : পেট্রোল না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছেন।

যুবতী ক্ষুব্ধ ধিক্কারে কেবল ঘাড় নাড়িলেন।

রঞ্জন : তা যেন হ'ল। আমি আপনাকে পেট্রোল দিলুম, বদলে আপনি আমাকে ঝাঝা পর্য্যন্ত পৌছে দিলেন। কিন্তু আমার গাড়ীটা কি এখানেই পড়ে থাক্‌বে ?

যুবতীর মনে আশা জাগিল। তিনি সাগ্রহে বলিলেন—

যুবতী : তা কেন ? আপনার মোটর বাইক আমার গাড়ীর পিছনের সীটে তুলে নিলেই হবে।

রঞ্জন এবার হাসিয়া ফেলিল ; সপ্রশংস নেত্রে যুবতীর পানে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন : ঠিক তো। ও কথাটা আমার মাথায় আসে নি। আপনার তো খুব উপস্থিত-বুদ্ধি !

এইবার সর্ব্বপ্রথম যুবতীর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—ধন্যবাদ, মিঃ—?

রঞ্জন : (তৎক্ষণাৎ) রঞ্জনপ্রকাশ সিংহ।

যুবতী : ধন্যবাদ রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন : না না, সে কি কথা, মিস—?

যুবতী কৌতুক চপল চোখে চাহিলেন।

যুবতী : মঞ্জু রায়।

রঞ্জন স্মিতমুখে দুই করতল একত্র করিল।

মঞ্জু তাহার অঙ্গাবরক ওভার-অল্ খুলিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ্।

কলিকাতার একটি প্রগতিশীল গৃহে ড্রয়িং রুম। বাড়ীর কর্ত্রী ও আরও তিনটি প্রবীণা মহিলা বিভিন্ন চেয়ারে বসিয়া আছেন। চায়ের উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছে।

চা পরিবেশন করিতে করিতে গৃহকর্ত্রী অন্যত্র সহৃদয়তার সহিত কথা বলিতেছেন; তাঁহার স্থূল আতিথেয়তার ভিতর দিয়া কিন্তু টেক্কা দিবার গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।

কর্ত্রী : রঞ্জন পাশ করেছে কি-না—হাজার হোক, ওর আপনার বলতে তো আমিই—তাই সামান্য একটু চায়ের আয়োজন করেছি—ওরে রামভরসা, কোথায় গেলি? এদিকে কেক নিয়ে আয়।

মহিলারা রঞ্জনের নাম শুনিয়া একেবারে স্থির-নেত্র হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমা মহিলা ঠক্ করিয়া নিজের চায়ের বাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—

প্রথমা মহিলা : অ্যাঁ! রঞ্জনের আস্‌বার কথা আছে না-কি?

দ্বিতীয়া মহিলার অধরোষ্ঠ বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; তিনি বলিলেন—ওমা, এমন জান্‌লে আমি যে মলিনাকে নিয়ে আসতুম—

তৃতীয়া মহিলার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

তৃতীয়া মহিলা: এ ভাই তোমার ভারি অন্যায়। আগে জানালে না কেন? আমার মীরার সঙ্গে রঞ্জনের কত ভাব! আগে জানলে মীরাকে নিয়ে আসতুম।

গৃহকর্ত্রী গাল ভরিয়া হাসিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের পরাজয়ের আনন্দে তাঁহার মেদ-মণ্ডিত গণ্ডদ্বয় পিণ্ডীভূত হইয়া উঠিল।

কর্ত্রী: রঞ্জন আর আমার ইন্দুতে যেমন ভাব, এমন আর কারুর সঙ্গে নয়। যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল। একদিনও দুজনে দুজনকে না দেখে থাক্‌তে পারে না।

অতিথিত্রয় এই অত্যন্ত অরুচিকর কথায় চিরেতা খাওয়ার মত মুখ করিয়া পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

ঘরের বাহিরে পদধ্বনি শুনা গেল। গৃহকর্ত্রী সচকিত আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিলেন।

কর্ত্রী: ঐ বুঝি রঞ্জন এল। (নেপথ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া) ওরে বিন্দি, ইন্দুকে ওপর থেকে ডেকে আন্ না—আর কত সাজগোজ করবে—

তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন।

বিধুবাবু দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া মহিলাগুলিকে একে একে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর হাসিমুখে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। সবগুলিকে এক জায়গায় পাইয়া তিনি খুশী হইয়াছেন বোধ হইল।

রঞ্জনের স্থানে বিধুবাবুকে পাইয়া গৃহকর্ত্রী নিরাশ হইলেন; শুষ্কস্বরে কহিলেন—বিধুবাবু! আসুন।

অন্য মহিলাগণ রঞ্জনকে না দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত ভাবে হাঁফ ছাড়িলেন।

বিধুবাবু আসিয়া গৃহকর্ত্রীর পাশের চেয়ারে বসিলেন। গৃহকর্ত্রী উৎকন্ঠিতভাবে ঘড়ির পানে তাকাইলেন।

কর্ত্রী: তাই তো, রঞ্জনের এত দেরী হচ্ছে কেন? পাঁচটা বাজতে চলল—সে তো কখনও এমন করে না!

বিধুবাবু ইতিমধ্যে রামভরসার হাত হইতে এক পেয়ালা চা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; চায়ে চুমুক দিতে গিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তারপর ধীর মন্থর কণ্ঠে প্রশ্ন কহিলেন—

বিধু: আপনারা কি রঞ্জনের অপেক্ষা করছেন!

কর্ত্রী: হ্যাঁ—তার জন্যেই তো আজ বিশেষ ক'রে চায়ের অয়োজন করেছিলুম।

বিধু: কিন্তু—

তিনি ধীরে সুস্থে একচুমুক চা পান করিলেন।

বিধু: রঞ্জন তো বোধ হয় আসতে পারবে না।

গৃহকর্ত্রী তাঁহার সমস্ত দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ বিধুবাবুর দিকে ফিরাইলেন।

কর্ত্রী: আসতে পারবে না! কেন?,

বিধুবাবু পুনরায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

বিধু : যেহেতু তার বাপ তাকে হঠাৎ কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কর্ত্রী : অ্যাঁ—সে কি ?

হাসি-হাসি মুখে এই সংবাদ-বোমা মহিলাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিধুবাবু চায়ের বাটীতে মন দিলেন। অন্য মহিলারাও কম বিচলিত হন নাই।

প্রথমা মহিলা : কই, আমরা তো কিছু জানি না !

বিধুবাবু মহিলাদের এই চাঞ্চল্য চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিতেছেন।

বিধু : আপনারা জানবেন কোত্থেকে ? প্রতাপ তো আর আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের ছেলেকে দেশান্তরী করে নি।

দ্বিতীয়া মহিলা : কিন্তু এরকম করবার মানে কি ?

তৃতীয় মহিলা : ছেলে সবে পাশ করেছে ; এখন কোথায় দু-চারদিন কলকাতায় আমোদ-আহ্লাদ করবে—

বিধু : (শান্ত স্বরে) প্রতাপ তার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছে।

সকলে : অ্যাঁ !

মহিলাগণ ব্যাকুলনেত্রে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন।

গৃহকর্ত্রী অনুনয়পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বিধুকে বলিলেন—

কর্ত্রী : সত্যি বলছেন বিধুবাবু ? (বিধু ঘাড় নাড়িলেন) ভিতরের কথাটা কি বলুন না, বিধুবাবু। কি হয়েছে ?

বিধুবাবু নেপথ্যের পানে তাকাইয়া হাঁকিলেন—

বিধু : ওরে রামভরসা, এদিকে কেক্ নিয়ে আয় তো।

কর্ত্রী : হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে বিধুবাবুকে কেক্ দে। তারপর, কথাটা কি বিধুবাবু? হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গেল কি ক'রে?

রামভরসা কেকপূর্ণ ট্রে লইয়া বিধুবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিধুবাবু সযত্নে একটি বড় গোছের কেক্ নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে কামড় দিলেন।

বিধু : (চিবাইতে চিবাইতে) কথাটা আর কিছু নয়, প্রতাপের ইচ্ছে রাজরাজড়ার ঘরে ছেলের বিয়ে দেয়। তাই, পাছে ছেলে ইতিমধ্যে কোনও মেয়ের 'লভে' পড়ে যায়, এই ভয়ে তাকে একেবারে ঝাঝায় পাঠিয়ে দিয়েছে। জংলী দেশ, সেখানে তো আর অলিতে গলিতে সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী পাওয়া যায় না।

চারিটি মহিলাই বিধুর কথা শুনিতে শুনিতে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমা মহিলা গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজ মনে উচ্চারণ করিলেন—

প্রথমা মহিলা : ঝাঝা!

তৃতীয়া মহিলা সহসা শূন্যের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—

তৃতীয়া মহিলা : ঝাঝা!

দ্বিতীয়া মহিলা পিন্‌বিদ্ধ-বৎ চেয়ার হইতে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

দ্বিতীয়া মহিলা : ঝাঝা!

বাকি দুটি মহিলাও আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

প্রথমা মহিলা : (গৃহকর্ত্রীকে) চললুম ভাই, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোহার সিন্দুক খোলা ফেলে এসেছি—

তিনি দ্রুত দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। বাকি দুইজন পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারাও দ্বারের দিকে ছুটিলেন ; তাঁহাদের সম্মিলিত ওজুহাত বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া গৃহকর্ত্রীর কাণে পৌঁছিল।

মিলিত স্বর : কর্ত্তার পায়ে মেয়ের সঙ্গে অন্য সময় হাতি-বাগানে স্যাকরা আসবার কথা আবার আর একদিন—

মহিলাগণ শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলেন।

গৃহকর্ত্রী হতভম্ব। তিনি বিধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলেন—বিধু পরম কৌতুকে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। হঠাৎ গৃহকর্ত্রীর মস্তিষ্করন্ধ্র বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে চলিলেন—

কর্ত্রী : ইন্দু! ওরে ইন্দু—ঝাঝা—ঝাঝা!

বিধু ধূর্ত্ত শৃগাল-হাস্য হাসিতে লাগিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মঞ্জুর মোটর চলিয়াছে। গাড়ীর হুড নামানো হইয়াছে ; পিছনের সীট্ হইতে রঞ্জনের মোটর-বাইক মাথা উঁচু করিয়া আছে।

গাড়ী চালাইতেছে মঞ্জু ; রঞ্জন তাহার পাশের সীটে বসিয়া

মঞ্জুর দিকে ফিরিয়া কথা কহিতেছে ; তাহার ডান হাতটা সীটের পিঠের উপর ন্যস্ত।

রঞ্জন : দেখুন মঞ্জু দেবী, আমাকে গাড়ীটা চালাতে দিলেই ভাল করতেন। এখনও প্রায় দেড়শ' মাইল যেতে হবে।

মঞ্জু : কতবারই তো গিয়েছি। নতুন কিছু নয়।

রঞ্জন : কিন্তু তবু, আমি যখন রয়েছি—

মঞ্জু ভ্রূ তুলিয়া ক্ষণেকের জন্য রঞ্জনের দিকে চাহিল।

মঞ্জু : আপনার কি বিশ্বাস আমার চেয়ে আপনি ভাল গাড়ী চালাতে পারেন?

এ কথার সোজা উত্তর মহিলাকে দেওয়া যায় না। রঞ্জন কাঁধের একটা ভঙ্গী করিয়া সম্মুখ দিকে তাকাইল।

রঞ্জন : পুরুষের নার্ভ আর মেয়েদের নার্ভ সমান নয়। হাজার হোক—

মঞ্জু : আমার নার্ভ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি আপনাকে খানায় ফেল্‌ব না।

রঞ্জন বেশ খানিকক্ষণ মঞ্জুর পানে চোখ পাতিয়া চাহিয়া রহিল ; তারপর সীটের পিঠ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহার চোখের মধ্যে একটা দুষ্টামিবুদ্ধি খেলা করিয়া গেল ; সে একবার আড়চোখে মঞ্জুর দিকে তাকাইয়া নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল। রুমালটা ঝাড়িয়া পাট খুলিয়া সেটাকে কোলের উপর রাখিয়া কোণাকুণিভাবে পাট করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে মৃদু গানের গুঞ্জন বাহির হইতে লাগিল।

মঞ্জু সকৌতুকে একবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইল।

মঞ্জু : হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি গান করুন ; তবু তো কিছু করা হবে।

রঞ্জন : বেশ তো। আমার গাইতে আপত্তি নেই।

রুমাল পাট করিতে করিতে সে গান ধরিল—

রঞ্জন : "দু'জনে দেখা হ'ল—মধু-যামিনী রে !"

গান শুনিতে শুনিতে মঞ্জুর মুখে চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। রঞ্জন প্রথম পংক্তি শেষ করিতেই সে দ্বিতীয় পংক্তি ধরিল—

মঞ্জু : "কেহ কিছু কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে।"

হাসিতে হাসিতে রঞ্জনের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার কোলের উপর মঞ্জুর দৃষ্টি পড়িল। কৌতূহলী মঞ্জু জিজ্ঞাসা করিল—

মঞ্জু : ওটা কি হচ্চে ?

রঞ্জন যে জিনিসটি তৈয়ারি করিতেছিল তাহা এবার ডান হাতের তেলোর উপর তুলিয়া ধরিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—

রঞ্জন : ইঁদুর।

উত্তর শুনিয়া মঞ্জু চমকিয়া একবার ঘাড় ফিরাইল ; তারপর উৎকণ্ঠিত চক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া গাড়ী চালাইতে চালাইতে বলিল—

মঞ্জু : ইঁদুর !

রঞ্জন : হ্যাঁ। এই যে দেখুন না কেমন লাফায় !

ডান হাতের উপর ইঁদুর রাখিয়া রঞ্জন সস্নেহে তাহার পিঠে বাঁ-হাত বুলাইতে লাগিল। রুমালের ইঁদুর জীবন্ত ইঁদুরের

মত তাহার হাতের ভিতর হইতে পিছলাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইঁদুর দেখিয়া ভয় পায় না—তা হোক সে রুমালের ইঁদুর—এমন মেয়ে কয়টা আছে? মঞ্জুর মুখ শুকাইয়া গেল; ত্রস্ত চোখে ইঁদুরের দিকে তাকাইয়া সে কোণ ঘেঁষিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জনের ইঁদুর এবার মস্ত এক লাফ দিয়া তাহার হাত হইতে বাহির হইয়া একেবারে মঞ্জুর কোলের উপর পড়িল। মঞ্জু চোখ বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এদিকে গাড়ীর অবস্থা শোচনীয়। স্টীয়ারিং হুইলের উপর মঞ্জুর হাত শিথিল হইয়া যাওয়ার ফলে গাড়ী স্বেচ্ছামত রাস্তার এধার হইতে ওধার পরিক্রমা করিতে করিতে চলিয়াছে। শেষে খানার ঠিক কিনারায় আসিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ী থামিয়া গেল।

গাড়ীর ভিতরে তখন রঞ্জন দৃঢ় মুষ্টিতে স্টীয়ারিং ধরিয়া ব্রেক কশিয়াছে, মঞ্জুর শিথিল হস্ত রঞ্জনের হাতের তলায় চাপা পড়িয়াছে।

রঞ্জন ছদ্ম ভর্ৎসনার চক্ষে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন: কি বলেছিলুম? আর একটু হ'লেই খানায় ফেলেছিলেন!

মঞ্জু: (কম্পিত কণ্ঠে) কিন্তু আপনিই তো—

রঞ্জন: নিন্—এবার আমাকে চালাতে দিন। জানি আমি মেয়েদের নার্ভ ভাল নয়—

মঞ্জু অত্যন্ত সুবোধ বালিকার ন্যায় স্টীয়ারিং ছাড়িয়া দিল। সে এমন বিনীত সম্ভ্রমের সহিত রঞ্জনের মুখের পানে তাকাইল যাহাতে মনে হয় রঞ্জনের কূট-বুদ্ধির উপর তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

গাড়ী চলিতেছে, এবার রঞ্জন চালক এবং তাহার পাশে বসিয়া মঞ্জু। রঞ্জনের অধরকোণে একটু হাসি আনাগোনা করিতেছে। সে আড় চক্ষে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন: এবার না হয় আপনি গান করুন।

মঞ্জু উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল। অস্তমান সূর্য্যের আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—

মঞ্জু: সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

রঞ্জনও সেই দিকে তাকাইল।

নানা বর্ণচ্ছটার মধ্য দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে।

রঞ্জনের কণ্ঠস্বর: পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি। গাড়ী চলিয়াছে। সুইচ্‌-বোর্ডের আলোয় মঞ্জু ও রঞ্জনের মুখ দেখা যাইতেছে। রঞ্জন সতর্কভাবে গাড়ী চালাইতেছে; তাহার দুই চক্ষু সম্মুখে নিবদ্ধ। মঞ্জুর ঢুল্‌ আসিতেছে। তাহার চোখ মাঝে মাঝে মুদিয়া আসিতেছে, আবার গাড়ীর ঝাঁকানিতে

খুলিয়া যাইতেছে। শেষে তাহার চোখদুটি ভালভাবে মুদিত হইয়া গেল; মাথাটি পাশের দিকে নত হইতে হইতে অবশেষে রঞ্জনের কাঁধে ঠেকিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

রঞ্জন একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; তারপরে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে সতর্ক চক্ষু সম্মুখে রাখিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড ইন্।

ঝাঝায় মঞ্জুর পিতা শ্রীকেদারনাথ রায়ের বাড়ী। কাল—প্রভাত। বাড়ীর ড্রয়িং রুমটি বেশ সুপরিসর ও মূল্যবান আসবাবে সাজানো। ঘরের এক কোণে শীতের সময় আগুন জ্বালিবার চিম্‌নি আছে, এই চুল্লী ঘিরিয়া কারুকার্য্য খচিত ম্যাণ্টেলপীস্। ঘর হইতে ভিতর দিকে যাইবার দ্বারের কাছে একটি বড় পিয়ানো।

কেদারবাবু একটি গদি-মোড়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার চোয়াল ও মাথা বেষ্টন করিয়া একটি পশমের গলাবন্ধ ব্রহ্মতালুর উপর গিঁট বাঁধা আছে। কেদারবাবু স্নায়বিক দন্তশূলে ভুগিতেছেন। এজন্য তাঁহার স্বভাবত কড়া মেজাজ সম্প্রতি আরও কড়া হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ডান দিকে একটু পিছনে একটি সচল চা-টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের বাটিতে চামচের ঠুং ঠাং শব্দ আসিতেছে। মঞ্জু চা তৈয়ার করিতে করিতে পিতাকে গতদিনের পথের বিপত্তির গল্প বলিতেছিল।

কেদারবাবু গলার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার-শব্দ করিলেন। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ; কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রায়ই এরূপ করিয়া থাকেন।

কেদার : হুঁ:। তারপর!

মঞ্জু গতদিনের ক্লান্তির পর আজ সকালে উঠিয়াই স্নান করিয়াছে ; একটি চওড়া কালোপাড় আটপৌরে শাড়ী ও হাতাকাটা মলমলের ব্লাউজ্ পরিয়া তাহাকে বৃষ্টিধৌত সদ্যস্ফুট মল্লিকাফুলের মত দেখাইতেছে। সে চা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া মুখ তুলিল।

মঞ্জু : তারপর আর কি—আমার কথাটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো। রাত্তিরে বাড়ীতে এসে ঘুমুলুম ; তারপর আজ সকালে উঠে তোমাকে চা তৈরি ক'রে দিচ্ছি।

কেদারবাবু গলার মধ্যে আবার হুঙ্কার ছাড়িলেন ; মঞ্জুর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া স্বভাবসিদ্ধ কড়া স্বরে প্রশ্ন করিলেন—

কেদার : হুঁ:। ছোকরা কেমন? ভদ্রলোক?

মঞ্জু স্মিত চোখদুটি শূন্যে পাতিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল ; তারপর ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল—

মঞ্জু : হাঁ—ভদ্রলোক।

কেদার : নাম কি?

মঞ্জু চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইতে লইতে বলিল—

মঞ্জু : শ্রীরঞ্জনপ্রকাশ সিংহ।

কেদারবাবুর ললাট ভ্রূকুটি কুটিল হইল ; তিনি প্রতিধ্বনি করিলেন—

কেদার : সিংহ !

কেদারবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার অন্তরে স্মৃতির আগুন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—

কেদার : সিংগি ! আমার যখন বয়স কম ছিল, একটা সিংগিকে জানতুম—পাজি নচ্ছার হতচ্ছাড়া লোক। আমার বন্ধু ছিল ; তারপর আজ পঁচিশ বছর তার মুখ দেখি নি। বোম্বেটে শয়তান—

মঞ্জু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; চায়ের পেয়ালা কেদারবাবুর সম্মুখে একটা ছোট টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু তাই বলে কি সব সিংগিই বোম্বেটে শয়তান হবে বাবা ?

কেদারবাবু বিবেচনা করিলেন, শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিলেন—

কেদার : তা না হতে পারে। নল দাও।

মঞ্জু : (বুঝিতে না পারিয়া) নল ?

কেদার : (ঈষৎ তিরিক্ষিভাবে) হাঁ করতে পারছি না, চা খাব কি করে ? নল দাও।

মঞ্জু : ও !

বুঝিতে পারিয়া মঞ্জু হাসিয়া উঠিল ; তারপর নল আনিতে গেল। ম্যাণ্টেল পীসের উপর একটি কাচের গেলাসে এক গোছা খড়ের নল ছিল। (যাহার সাহায্যে সরবৎ চুষিয়া খাইবার

ফ্যাসান হইয়াছে); মঞ্জু তাহারই একটি আনিতে আনিতে স্নেহকৌতুক-বিগলিতকণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু তুমি কি কাণ্ডটাই করলে! সামান্য একটু দাঁতের ব্যথা হয়েছিল, অমনি আমাকে টেলিগ্রাম!

কেদারবাবুর চেয়ারের দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া মঞ্জু খড়ের নল তাঁহার হাতে দিল। কেদারবাবু একবার কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইলেন।

কেদার : দাঁতের ব্যথা সামান্য ব্যাপার! জানো, দাঁতের ব্যথায় কত লোক মারা গেছে? হুঁ!

তিনি চায়ের মধ্যে খড় ডুবাইয়া চুষিতে আরম্ভ করিলেন। মঞ্জু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—

মঞ্জু : ছি বাবা, তোমার যত অলক্ষুণে কথা।

মঞ্জু পিতার চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিল—দুষ্টামি-ভরা স্বরে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু আসল কথাটি আমি বুঝেছি—আমাকে না দেখে তুমি থাকতে পারো না, যা হোক একটা ছুতো ক'রে ডেকে পাঠাও।

কেদারবাবু ক্ষণেকের জন্য মুখ তুলিলেন; তাঁহার মুখের উপর দিয়া এমন একটা ভাব খেলিয়া গেল যাহাকে হাসি বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন—

কেদার : হুঃ থাকতে পারি না! হুঃ!

মঞ্জু : পারোই না তো! বোর্ডিংয়ে সবাই আমায় কত ঠাট্টা করে। বলে, বাবার নয়ন-মণি মেয়ে!

বিগলিত স্নেহে মঞ্জু কেদারবাবুর গ্রিঁট-বাঁধা মস্তকের উপর গাল রাখিল। এবার একটি অসন্দিগ্ধ হাসি সত্য সত্যই কেদারবাবুর মুখে দেখা গেল; কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। আবার গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন—

কেদার : কি নাম—সেই সিংগি ছোকরা আজ এখানে আসবে নাকি?

মঞ্জু উঠিয়া বসিয়া একটু চিন্তা করিল।

মঞ্জু : রঞ্জনবাবু? কি জানি আসবেন কি-না—কিছু তো বলেন নি। আসবেন হয় তো।

কেদারবাবু একটি হুঙ্কার দিয়া চায়ে নল-সংযোগ করিলেন। মঞ্জু অলসপদে উঠিয়া গিয়া নিজের পেয়ালায় চা ঢালিল। একটু অন্যমনস্কভাবে পেয়ালাটি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের নিকট পদশব্দ শুনা গেল। মঞ্জু তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা রাখিয়া সাগ্রহে দ্বারের দিকে তাকাইল।

দ্বার দিয়া যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি বয়সে রঞ্জনের সমসাময়িক হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইনি অতিশয় শীর্ণকায় ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট। একটি ছোট ক্যামেরা তাঁহার কাঁধ হইতে উপবীতের ন্যায় চামড়ার অবলম্বনের সাহায্যে ঝুলিতেছে।

মঞ্জু ঈষৎ আশাহত কণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু : ও—মিহিরবাবু !

মিহির ভাবাতুর নেত্রে চাহিল ।

মিহির : আকাশে চাঁদ উঠেছে !

কেদারবাবুও মিহিরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন ; অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিলেন—

কেদার : অ্যাঁ ! কি বলছ হে ছোকরা ? বেলা সাড়ে আটটার সময় আকাশে চাঁদ উঠেছে !

মিহির ভাবুকের ভঙ্গীতে মাথাটি দোলাইতে দোলাইতে কেদারবাবুর সম্মুখস্থ চেয়ারে আসিয়া বসিল—

মিহির : আপনি ভুল বুঝেছেন । জাপানী কায়দায় একটি কবিতা লিখেছি তাই আবৃত্তি করছিলুম ।

কেদারবাবু একটি নাতিক্ষুদ্র হুঙ্কার ছাড়িয়া চায়ের পেয়ালায় অবহিত হইলেন । মঞ্জু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—

মঞ্জু : জাপানী কায়দাটা কি রকম ?

মিহির : শুনবেন ? (ভঙ্গীসহকারে)

"আকাশে চাঁদ উঠেছে !
যেন রে ফুল ফুটেছে ।
গন্ধে মন লুটেছে ।

কেদারবাবু মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কবি আর কথা কহিলেন না । কেদারবাবু তখন অধীর হইয়া বলিলেন—

কেদার । তারপর কি ?

মিহির : তারপর আর নেই—ঐখানেই শেষ!

কেদারবাবু কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিলেন।

কেদার : শেষ! তিন লাইনে কবিতা শেষ! হুঁ:! যত সব—

ক্রুদ্ধভাবে কেদারবাবু চায়ে খড় ডুবাইয়া চুষিতে লাগিলেন। মিহির ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাহার চক্ষে শিল্পী-জনোচিত উদ্দীপনা ফুটিয়া উঠিল। সে একাগ্রভাবে কেদারবাবুর চা-পান দেখিতে লাগিল।

মিহির : বাঃ! চমৎকার! একটা নতুন দৃশ্য। কেদার-বাবু, নড়বেন না, আমি আপনার ছবিটা জাপানী ভঙ্গীতে তুলে দিই।

ক্ষিপ্রহস্তে ক্যামেরা বাহির করিয়া মিহির কেদারবাবুর উপর লক্ষ্য স্থির করিল। কেদারবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

কেদার : খবরদার ছোকরা, আমার দন্তশূল হয়েছে—এখন আমার ছবি তুললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

কেদারবাবুর চক্ষে হিংস্র আপত্তি দেখিয়া মিহির দুঃখিতভাবে নিরস্ত হইল। মঞ্জু কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিষণ্ণ-ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া মিহির আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। মঞ্জু আঁচলের প্রান্ত ঠোঁটের উপর চাপিয়া হাসি নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিহির ক্যামেরা বাগাইয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

মিহির : মঞ্জু দেবী, ঠিক যেমন আছেন তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন; আপনার ছবিটা জাপানী স্টাইলে তুলে নি।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল।

মঞ্জু : ধন্যবাদ, জাপানী স্টাইলের থ্যাব্‌ড়া মুখের ছবি আমার দরকার নেই। তার চেয়ে আপনি এক পেয়ালা চা খান।

মিহিরের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িল, হতাশভাবে ক্যামেরাটি খাপে পূরিবার উপক্রম করিয়া সে নিরুৎসুক স্বরে প্রশ্ন করিল—

মিহির : জাপানী চা?

মঞ্জু : উঁহু—দার্জ্জিলিং।

মিহির : (নিশ্বাস ফেলিয়া) তবে থাক।

মিহির উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দ্বারের দিকে চলিল। প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এমন সময় রঞ্জন বাহির হইতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন মিহিরকে দেখিতে পাইল না, প্রথমেই তাহার দৃষ্টি মঞ্জুর উপর গিয়া পড়িয়াছিল। সে স্মিতমুখে হাত তুলিয়া বলিল—

রঞ্জন : নমস্কার!

সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মিহির ক্যামেরা খাপে পূরিতে পূরিতে মধ্যপথে থামিয়া গিয়া গভীর কৌতূহলে রঞ্জনের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ক্যামেরাটি আবার বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু নবাগত রঞ্জনকে তীক্ষ্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, মঞ্জু তাঁহার কাছে আসিয়া চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু : বাবা, ইনিই রঞ্জনবাবু!

রঞ্জন করযোড়ে কেদারবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় পাশ হইতে ক্লিক্ করিয়া ক্যামেরার শব্দ হইল। সকলে এক সঙ্গে ঘাড় ফিরাইলেন।

মিহির ক্যামেরা খাপে পুরিতে পুরিতে বাহির হইয়া যাইতেছে; দ্বারের কাছে পৌছিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল।

মিহির : নমস্কার! (মিহির প্রস্থান করিল)

রঞ্জন ঈষৎ বিস্ময়ে দু'জনের মুখের পানে চাহিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—

রঞ্জন : ইনি কে?

কেদার : উনি একটি হনুমান। আপনি বসুন।

রঞ্জন কেদারবাবুর সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিল।

রঞ্জন : (বসিতে বসিতে) হনুমান!

কেদার : হ্যাঁ। বাপের কিছু পয়সা আছে তাই জাপানী কায়দায় কবিতা লিখে, আর ফটোগ্রাফ্ তুলে বেড়ান।

রঞ্জন চকিতে একবার মঞ্জুর মুখের পানে চাহিল; যেন এই কবির প্রতি মঞ্জুর মনের ভাবটা কিরূপ তাহা জানিতে চায়। কিন্তু মঞ্জুর মুখের নিগূঢ় হাসি হইতে কিছুই ধরা গেল না। রঞ্জন গম্ভীর মুখে বলিল—

রঞ্জন : ও! বাঃ—বেশ তো।

কেদার সন্দিগ্ধ ভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিলেন।

কেদার : আপনিও কবিতা লেখেন না কি?

রঞ্জন : আজ্ঞে জীবনে এক লাইন কবিতা লিখি নি।

কেদারবাবু গলার মধ্যে পরিতোষ-সূচক একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার দিলেন।

কেদার : বেশ বেশ। আপনার কি করা হয়?

রঞ্জন : (বিনীতভাবে) আজ্ঞে, এই সবে এম্-এস্‌সি পাশ করেছি।

কেদারবাবু অধিকতর পরিতোষ জ্ঞাপন করিয়া হুঙ্কার দিলেন।

কেদার : বেশ বেশ খুশী হলুম।—মঞ্জু, এঁকে চা দাও।

মঞ্জু চায়ের টেবিলের দিকে গেল। কেদারবাবু এতক্ষণে একটি মনোমত প্রসঙ্গ পাইয়া বেশ উৎসাহের সহিত মাথার উপরকার গিঁট খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

কেদার : সায়েন্সই হচ্ছে আজকাল একমাত্র পড়বার জিনিস! তা না পড়ে' আজকালকার ছোঁড়ারা পড়্‌তে যায় কাব্য আর ফিলজফি—ছ্যাঃ! আমার মেয়েকে আমি সায়েন্স পড়াচ্ছি।

মঞ্জু চায়ের বাটি আনিয়া রঞ্জনকে দিল; রঞ্জন স্মিতমুখে উঠিয়া পেয়ালা লইয়া আবার বসিল। মঞ্জু বাপের চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কেদারবাবু বলিয়া চলিলেন—

কেদার : Mechanics, আবিষ্কার, invention—এরির ওপর বর্ত্তমান পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে! (সহসা রঞ্জনকে) আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন?

রঞ্জন : (চমকিয়া) আজ্ঞে আবিষ্কার! আমি? (সে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হইতে বামে মাথা নাড়িল) আজ্ঞে না।

কেদার : একটাও না?

রঞ্জন হাতের পেয়ালা পাশে টিপয়ের উপর রাখিয়া মাথা চুল্‌কাইল। আবিষ্কার করিয়াছে বলিতে পারিলেই ভাল হয়, কেদারবাবু খুশী হন। কিন্তু—

রঞ্জন: আজ্ঞে কই মনে করতে তো পারছি না।

কেদার গলাবন্ধ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। মঞ্জু তাঁহার চেয়ারের পিঠের উপর কনুই রাখিয়া করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া রঞ্জনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া আছে। সে এখন আস্তে আস্তে কথা কহিল—

মঞ্জু: আপনার একটা আবিষ্কারের কথা কিন্তু আমি জানি।

রঞ্জন চমকিয়া তাকাইল।

রঞ্জন: অ্যাঁ! কি?

মঞ্জু। (মুখ টিপিয়া) ইঁদুর?

ইঁদুরের প্রসঙ্গে রঞ্জন বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। কেদারবাবু সবিস্ময়ে ঘাড় বাঁকাইয়া মঞ্জুর দিকে চাহিলেন।

কেদার: ইঁদুর?

মঞ্জু: (ছদ্ম গাম্ভীর্যে) হ্যাঁ। ওঁকেই জিগ্যেস কর না—একেবারে জ্যান্ত ইঁদুর।

কেদারবাবু রঞ্জনের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন—

কেদার: আপনি ইঁদুর আবিষ্কার করেছেন?

রঞ্জন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

রঞ্জন: আজ্ঞে সে কিছু নয়—সামান্য রুমাল দিয়ে—ছেলেমানুষী—

রঞ্জন ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে মঞ্জুর পানে তাকাইল। কেদারবাবু কিন্তু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন।

কেদার : আবিষ্কার কখনও ছেলেমানুষী হতে পারে? কি করেছেন দেখি?

রঞ্জন : (করুণভাবে) আজ্ঞে নেহাৎ বাজে জিনিস—সকলেই জানে।

কেদার কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

কেদার : তা হোক, দেখি।

রঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল, ক্ষুব্ধ কটাক্ষে মঞ্জুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মুখে কাপড় গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি রোধ করিতেছে। গত সন্ধ্যার প্রতিশোধ লইয়া সে যে খুশী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রঞ্জন ইঁদুর তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেদারবাবু দুই চক্ষে আগ্রহ ও একাগ্রতা ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইঁদুর প্রস্তুত হইলে রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন : এই নিন, হয়েছে।

ইঁদুরটিকে ডান হাতের উপর রাখিয়া রঞ্জন বাঁ হাতে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। ইঁদুর পিছলাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার হাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রঞ্জন তাহার ল্যাজ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল।

ইঁদুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে কেদারবাবুর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। হাসি ক্রমে প্রসার লাভ করিল; তাঁহার গলা

হইতে নানা প্রকার কৌতুক-দ্যোতক শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে তিনি দুই হাতে পেট চাপিয়া ধরিয়া হো হো শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাহা নিমেষকালের জন্য। পরক্ষণেই তাঁহার উচ্চ হাস্য উচ্চতর কাতরোক্তিতে পরিণত হইল। মুখ অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া তিনি একহাতে গাল চাপিয়া ধরিলেন।

কেদার : উহুহুহু—

রঞ্জন শঙ্কিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন : কি হ'ল! কি হ'ল!

কেদার : দাঁত! উহুহুহু—দাঁত!

মঞ্জু পিছন হইতে ছুটিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া তাড়াতাড়ি গলাবন্ধটা আবার তাঁহার গালের পাশে জড়াইতে লাগিল। রঞ্জন চেয়ারের অন্য পাশে দাঁড়াইয়া এই শুশ্রূষা কার্য্যে মঞ্জুকে সাহায্য করিতে লাগিল। কেদারবাবু কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে মস্তক শীর্ষে গিঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হইল। মঞ্জু ও রঞ্জনের হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হইয়া যাইতেছিল তাহা যেন উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না।

কেড্ আউট্।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। রাস্তার ধারেই স্তম্ভযুক্ত ফটক; ফটক হইতে দশ-বারো গজ ভিতরে বাড়ী। বাড়ীর ভিৎ উঁচু; কয়েক ধাপ সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া সদর বারান্দায় উপনীত হইতে হয়।

পথ বেঁধে দিল

সিঁড়ির উচ্চতম সোপানে বসিয়া মঞ্জু নিবিষ্ট মনে একটি জাপানী ফ্রেমে আঁটা ফটোগ্রাফ্ দেখিতেছে। ফটোগ্রাফ্‌টি রঞ্জনের; কয়েকদিন পূর্ব্বে যাহা মিহির আচমকা তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

মিহিরও উপস্থিত আছে। সে মঞ্জুর পাশে বসিয়া এক হাত মেঝেয় রাখিয়া গলা বাড়াইয়া ফটোটি দেখিতেছে; তাহার মুখে কৃতী শিল্পীর গর্ব্ব সুপরিস্ফুট। চিরসঙ্গী ক্যামেরাটি অবশ্য তাহার সঙ্গেই আছে।

মঞ্জু মগ্নভাবে ছবিটি হাঁটুর উপর রাখিয়া দেখিতেছে; ছবির শিল্পকলা অথবা মানুষটি—কিসে মঞ্জু বেশী অভিভূত ঠিক বোঝা যাইতেছে না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মিহির জিজ্ঞাসা করিল—

মিহির: কেমন? ঠিক জাপানী স্টাইলে হয় নি?

মঞ্জু একবার মিহিরের দিকে তাকাইয়া ছবিটিকে সমালোচকের নিষ্করুণ দৃষ্টি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিল।

মঞ্জু: হুঁ! আপনি তো বেশ ফটো তোলেন।

মিহির আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া দুই হাত দিয়া নিজের একটা হাঁটু আলিঙ্গন করিয়া আকাশের পানে তাকাইল।

মিহির: জাপানী টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করেছি। জগতের শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্ছে জাপানী আর্ট। একটা জাপানী কবিতাও লিখেছি—শুনবেন।

মঞ্জু একটু শঙ্কিত হইল।

মঞ্জু : আবার জাপানী কবিতা! তা বলুন, এক মিনিটে তো ফুরিয়ে যাবে!

মিহির যথাযোগ্য ভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করিল—

মিহির : "চেরীর বনে একটি মেয়ে জাপানী
মনের সুখে খাচ্ছে বসে চা-পানি
পরণে তার একটি কেবল কিমোনো
জাগ্ রে কবি—আর কি সাজে ঝিমানো?"

ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে দুই হস্ত লীলায়িত করিয়া মিহির কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, হঠাৎ ফটকের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে তদবস্থায় থামিয়া গেল।

ফটকের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া একটি আধুনিকা তরুণী যাইতেছিলেন। অলস মন্থর গতি; কাঁধের উপর একটি রঙীন প্যারাসোল অলসভাবে ঘুরিতেছে; তরুণী একবার ফটকের ভিতরে অলস নেত্রপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিহির ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গি ত্যাগ করিয়া চিড়িক্ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে কবি-সুলভ ভাবালুতা। সে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

মঞ্জু এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল; গূঢ় কৌতুকে মৃদু হাসিয়া বলিল—

মঞ্জু : চললেন না কি মিহিরবাবু?

মিহির থামিল না, পিছু ফিরিয়া তাকাইল না; কেবল একটা হাত নাড়িয়া বলিল—

মিহির : হ্যাঁ—নমস্কার।

তরুণী যে-পথে গিয়াছিলেন, মিহির দ্রুতপদে ফটক পার হইয়া সেই পথ ধরিল।

হাসিয়া মঞ্জু ছবির দিকে চোখ নামাইল। বেশ কিছুক্ষণ ভাল করিয়া ছবিটি দেখিয়া লইয়া সে সচকিতে চারিদিকে তাকাইল। কেহ দেখিয়া ফেলে নাই। সে তখন উঠিয়া ছবিটা দোলাইতে দোলাইতে—যেন ছবিটার প্রতি তাহার কোনই লোভ নাই এম্‌নিভাবে—বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কাট্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং রুম। একটি সোফার উপর কেদারবাবু একটা হাঁটু তুলিয়া পাশ ফিরিয়া বসিয়াছেন; সোফার উপর একটি রুমাল পাতিয়া সেটিকে নানাভাবে পাট করিয়া ইঁদুর তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সতর্ক চক্ষু দুটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুসুলভ ক্রীড়া যাহাতে কেহ দেখিয়া না ফেলে।

বহির্দ্বারের নিকট মঞ্জুর পদশব্দ শুনিয়া কেদারবাবু চট করিয়া রুমালটি পকেটে পূরিলেন, তারপর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঞ্জু ঘরে ঢুকিয়া চোখের কোণ দিয়া কেদারবাবুকে দেখিয়া লইল; তারপর অন্যমনস্কভাবে একটা সুর গুন গুন করিতে করিতে ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ক্রমে একবার নিজের ঘরে পৌঁছিতে পারিলে হয়।

সে দরজার চৌকাঠ অবধি পৌঁছিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে কেদারবাবুর কণ্ঠস্বর আসিল—

কেদার : তোর হাতে ওটা কিরে মঞ্জু ?

ধরা পড়িয়া গিয়া থতমতভাবে মঞ্জু দাঁড়াইয়া পড়িল ; তারপর সাম্‌লাইয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের ভাণ করিয়া বলিল—

মঞ্জু : এটা ? ওঃ ! সেদিন মিহিরবাবু যে ফটো তুলেছিলেন সেইটে দিয়ে গেলেন।

কেদার হাত বাড়াইয়া বলিলেন—

কেদার : দেখি।

অগত্যা ছবিটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিতে হইল। কেদারবাবু সেটি দু'হাতে ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন ; তারপর চশ্‌মা বাহির করিয়া পরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। শেষে একটা হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—

কেদার : মন্দ তোলে নি ছোঁড়া ! তা ছাড়া, এ ছোকরার চেহারাটাও খাসা।

তিনি ঘরের এদিক-ওদিক দেয়ালের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, যেন ছবিটি টাঙাইবার একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছেন।

কেদার : ঐখানে ঠিক হবে ! কি বলিস্ ?

তিনি জানালার পাশে একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মঞ্জু দেখিল পিতৃদেব যখন ছবিটি দখল করিয়াছেন তখন আর তাহা উদ্ধারের উপায় নাই। সেও ঘরের দেয়ালগুলি দেখিতে দেখিতে বলিল—

মঞ্জু : ঐখানে ? না বাবা, তার চেয়ে ঐ দেয়ালে বেশ ভাল হবে।

মঞ্জু আর একটা স্থান নির্দ্দেশ করিল।

কেদার : ওখানে ভাল হ'লেই হ'ল ? আমি বলছি ঐখানে ঠিক হবে।

মঞ্জু : কিন্তু আলো লাগবে না যে !

কেদার : হুঁঃ, আলো লাগবে না ! আলবৎ লাগবে। দেখি তো কেমন না লাগে।

তিনি ছবি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার : তুই যা, চট্ ক'রে একটা হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আয়। আমি এখুনি টাঙিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জু : কোথায় পাব হাতুড়ি আর পেরেক ?

কেদার : ছাখ্ না, বাড়ীতেই কোথাও আছে।

মঞ্জু : আচ্ছা দেখছি। কিন্তু ঐ দেয়ালে হ'লেই ভাল হ'ত।

কেদার : না না, তুই ছেলেমানুষ এসব কী বুঝবি ! হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আয় তো আগে—

মঞ্জু অনিচ্ছাভরে বাড়ীর অন্দরের দিকে চলিল ; কেদার ছবিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার মনোনীত দেয়ালে কেমন মানাইবে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

কাট্।

ঝাঝার একটি পথ। বেশী লোক চলাচল নাই। রঞ্জন এই পথ দিয়া মোটর সাইকল্ চালাইয়া আসিতেছে। তাহার

চোখে মোটর গগ্‌ল্‌ থাকা সত্ত্বেও মুখখানা বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছে।

যে তরুণীটিকে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি তিনিও এই পথ দিয়া প্যারাসোল ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইতেছেন।

রঞ্জনের মোটর সাইকল্‌ তাঁহার পাশ দিয়া বিপরীত মুখে চলিয়া গেল। তরুণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তার পর হাত তুলিয়া ডাকিলেন—

তরুণী: রঞ্জনবাবু! অ রঞ্জনবাবু!

রঞ্জন কিছু দূর আগাইয়া গিয়াছিল, ডাক শুনিয়া গাড়ী থামাইল। তরুণী হাস্যমুখে তাহার সম্মুখস্থ হইলেন।

তরুণী: (বিস্ময়মিশ্রিত কলকণ্ঠে) এ কি রঞ্জনবাবু—আপনি এখানে? ভারি আশ্চর্য্য তো। কে ভেবেছিল যে—

তরুণী থামিয়া গেলেন; অপ্রত্যাশিত মিলনের অপরিমিত আনন্দ যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখের গগ্‌ল্‌ খুলিয়া ফেলিল। তরুণীকে চিনিতে পারিয়া সেও হাসিল বটে কিন্তু হাসির মধ্যে তেমন প্রাণ মাতানো আহ্লাদ ফুটিয়া উঠিল না।

রঞ্জন: তাই তো, ইন্দু দেবী যে! আপনি এখানে কবে এলেন?

ইন্দু: আমি কাল এসেছি। আপনিও যে এখানে এসেছেন তা কে জান্‌তো?

রঞ্জন: কেউ না। অর্থাৎ যাক্‌, বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

ইন্দু : হ্যাঁ—কলকাতায় যা গরম—

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল, যেন পলায়নের রাস্তা খুঁজিতেছে।

ইতিমধ্যে মিহির যে ইন্দুর অনুসরণ করিয়া অকুস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। মিহির ইহাদের কিছু দূরে তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে এবং নিজের ক্যামেরাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

ইন্দু কথা বলিয়া চলিয়াছে—

ইন্দু : প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাই পালিয়ে এলুম। এখানে তবু ঠাণ্ডা।—তারপর, আপনি এখন চলেছেন কোথায় ?

কোথায় যাইতেছে তাহা বলিবার অভিপ্রায় রঞ্জনের একেবারেই ছিল না ; সে ভাসা ভাসা উত্তর দিল—

রঞ্জন : বিশেষ কোথাও নয়—এম্‌নি—একটু এদিক-ওদিক বেড়াতে—

ইন্দু : ও—তা আমাদের বাড়ীতেই চলুন না।

রঞ্জন বিপন্ন হইয়া পড়িল।

রঞ্জন : মানে—কথা হচ্ছে যে—

ইন্দু বাঁকা হাসিয়া বলিল—

ইন্দু : ভয় কি ! আমি একা নই—বাড়ীতে মা আছেন।

রঞ্জন ভয় পাইয়া গেল।

রঞ্জন : মা ! ইব্‌ব্‌—অর্থাৎ কিনা—মা ?

ইন্দু : হ্যাঁ—তিনিও এসেছেন কি না।

রঞ্জন দেখিল আর উদ্ধার নাই, সে ঘাড় চুলকাইল।

রঞ্জন : ও—তা—কি বল—

এই সময় দূরে চটুল বাদ্যযন্ত্রের নিক্কণ শোনা গেল ; শব্দ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। ইন্দু সেইদিকে তাকাইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল—

ইন্দু : বাঃ! কী সুন্দর! দেখুন দেখুন—

একটি সাঁওতাল-মিথুন পথের মোড়ের উপর নৃত্য সুরু করিয়াছে ; সঙ্গে বাঁশী ও মাদল বাজিতেছে। কয়েকজন পথচারী তাহাদের ঘিরিয়া দেখিতেছে।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দেহের নিটোল যৌবন নৃত্যের ছন্দে ছন্দে যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। ইন্দু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিল।

নৃত্য চলিতেছে। রঞ্জন আড় চোখে ইন্দুর পানে তাকাইয়া দেখিল, সে মগ্ন হইয়া নৃত্য দেখিতেছে, অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। রঞ্জন সন্তর্পণে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরিয়া পিছু হটিতে লাগিল। ইন্দু কিছু জানিতে পারিল না। রঞ্জন কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া লইল ; তারপর গাড়ীটি ঠেলিতে ঠেলিতে এবং সশঙ্কচক্ষে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে অদৃশ্য হইল।

এদিকে নৃত্য ক্রমে শেষ হইল। নর্ত্তক-নর্ত্তকী দর্শকদের সেলাম করিয়া দক্ষিণার জন্য হাত পাতিল।

ইন্দু হাতের ব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিল—

ইন্দু ঃ চমৎকার! না রঞ্জনবাবু?

পাশে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল রঞ্জন নাই, তাহার স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি যুবক দন্তবিকাশ করিয়া আছে।

মিহির ঃ ভারি সুন্দর!

ইন্দু ঃ (বিস্মিত ক্ষোভে) এ কি? আপনি কে? রঞ্জনবাবু কোথায়?

সে পিছন ফিরিয়া দেখিল কিন্তু পথে রঞ্জন বা তাহার গাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই। মিহির বিগলিতস্বরে বলিল—

মিহির ঃ আমার নাম মিহিরনাথ মণ্ডল। রঞ্জনবাবু অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

ইন্দুর মুখ ও চোখের চাহনি কঠিন হইয়া উঠিল।

ইন্দু ঃ অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

মিহির এই ফাঁকে ক্যামেরা বাহির করিল।

মিহির ঃ দেখুন, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে ঐ প্যারাসোল মাথায় দিয়ে—ঠিক জাপানী মেয়ের মত। একটু দাঁড়ান ঐভাবে।

মিহির ক্যামেরা উদ্যত করিল। ইন্দু তাহার প্রতি একটা তীব্র বিরক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে ক্যামেরার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল।

মিহির ক্যামেরা হইতে চোখ তুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ 'করিয়া তাকাইতে লাগিল।

কাট্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং-রুম। মঞ্জু আসিয়া তাঁহাকে একটি হাতুড়ি পেরেক দিল; তিনি সে-দুটি দু'হাতে লইয়া হৃষ্টস্বরে বলিলেন—

কেদার: তুই ছবিটা নিয়ে আয়।

তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দেয়ালের দিকে গেলেন। ছবিটা টিপায়ের উপর রাখা ছিল, মঞ্জু সেটা হাতে লইল।

মঞ্জু: তোমার নিজের পেরেক ঠোকবার কি দরকার বাবা, চাকরদের কাউকে ডাকলেই তো ঠুকে দিতে পারে।

কেদার দেয়ালের কাছে পৌছিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন।

কেদার: চাকরে আমার চেয়ে ভাল পেরেক ঠুকতে পারে? হুঁ!

মঞ্জু: তা নয়—তবে—

কেদার: তবে মিছে বকিস্ নি—নিয়ে আয়।

কেদার পেরেকটিকে দেয়ালের এখানে ওখানে দাঁড় করাইয়া ঠিক কোন্ স্থানটি উপযোগী তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। শেষে একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া পেরেকটি সেখানে দাঁড় করাইয়া হাতুড়ি দ্বারা দু-তিন বার মৃদু আঘাত করিলেন; তারপর জোরে আঘাত করিবার জন্য হাতুড়ি তুলিলেন। ঠিক এই সময় পিছন হইতে মঞ্জুর গলা শোনা গেল।

মঞ্জু: ওঃ! রঞ্জনবাবু!

বিঘ্ন হইল। কেদারবাবুর উদ্যত হাতুড়ি তাঁহার বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর গিয়া পড়িল। হাতুড়ি ও পেরেক ছাড়িয়া দিয়া কেদারবাবু লাফাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

কেদার : উঃ! গিছি রে—উহুহু—গিছি রে বাবা—

রঞ্জন সদ্য ঘরে ঢুকিয়াছিল ; সে উৎকণ্ঠিতভাবে আগাইয়া মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিল—

রঞ্জন : কী হয়েছে ?

কেদারবাবু যন্ত্রণায় নাচিতে নাচিতে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে নানা প্রকার অর্থহীন কাতরোক্তি বাহির হইতে লাগিল।

রঞ্জন আসিয়া মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

রঞ্জন : তাই তো—লেগেছে না কি ?

মঞ্জু : (অস্থিরভাবে) হ্যাঁ—হাতুড়ি দিয়ে—বুড়ো আঙুলে। কি করি এখন ?

কেদার ক্রুদ্ধ চক্ষে তাহার পানে তাকাইলেন।

কেদার : দাঁড়িয়ে দেখছ কী ? ফুঁ দিতে পারো না ?

এই বলিয়া তিনি আহত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহাদের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিলেন।

মঞ্জু ও রঞ্জন ছুটিয়া গিয়া কেদারের চেয়ারের দুই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তার পর একসঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল।

দু'জনে মুখোমুখি ফুঁ দিয়া চলিল। এইভাবে ফুঁ দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কোনও মাধুর্য্য আছে ; দু'জনের মুখ হইতেই উৎকণ্ঠার ভাব কাটিয়া গিয়া উৎসাহ দেখা দিল।

ঝুন্নু : (ফুঁ দিতে দিতে মঞ্জুকে) কালশিরে পড়ে গেছে।

মঞ্জু : হুঁ—

দ্বিগুণ উৎসাহে ফুঁ দেওয়া চলিল। কেদারবাবুর কাতরোক্তিও ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কলিকাতায় প্রতাপবাবুর গৃহে বসিবার ঘর। জনৈক রাজা-শ্রেণীর বড় জমিদারের ম্যানেজার এবং প্রতাপ মুখোমুখি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মাঝখানে একটি কাঁচে ঢাকা নীচু গোল টেবিল। টেবিলের উপর ফল, মিষ্টান্ন, চা প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। প্রতাপের পাশে একটি ছোট টিপায়ের উপর টেলিফোন যন্ত্র।

ম্যানেজারবাবুর চেহারাটি চতুষ্কোণ; তিনি থাকিয়া থাকিয়া একটি রসগোল্লা দুই আঙুলে ধরিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছেন। প্রতাপ একটি বিবাহযোগ্যা বালিকার ফটো মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন।

দেখা শেষ করিয়া প্রতাপ ফটোটি ম্যানেজারকে ফেরৎ দিয়া শূন্যে তাকাইয়া বলিলেন—

প্রতাপ : ফটো দেখে তো ভালই মনে হচ্চে—

ম্যানেজার ফটোটি পাঞ্জাবীর পকেটে রাখিয়া মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন—

ম্যানেজার : আরে মশাই, রাজার ঘরের মেয়ে ভাল হবে না তো কি ঘুঁটে কুড়ুনির মত হবে ?

তিনি আর একটি রসগোল্লা মুখে ফেলিলেন।

প্রতাপ : তা বটে—তা বটে। কিন্তু তবু একবার নিজের চোখে দেখা দরকার।

ম্যানেজার : তা বেশ। দেখতে চান দেখুন—আপত্তি কি ?

এই সময় টেলিফোন যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। ম্যানেজারের প্রতি একটি অর্দ্ধোচ্চারিত বিনয়োক্তি করিয়া প্রতাপ টেলিফোন তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপ : মাফ্ করবেন। হ্যালো! কে বিধু ? এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি—কী খবর ?

কাট্।

তারের অন্য প্রান্তে বিধু কথা কহিতেছেন।

বিধু : শোনো নি ? যে ক'টি ভদ্রমহিলার বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে তাঁরা সবাই হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।

কাট্।

প্রতাপ একটু বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন।

প্রতাপ : গেছেন তো গেছেন—আমার তাতে কি ?

কাট্।

বিধু : আরে, চটো কেন ? আমার কি মনে হয় জানো ? ভদ্রমহিলারা সব মেয়ে নিয়ে—এই—ঝাঝার দিকেই যাত্রা করেছেন।

কাট্।

প্রতাপের চক্ষু বিস্ফারিত হইল, চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল।

প্রতাপ : অ্যাঁ—বল কি বিধু? তবে কি তারা কিছু জানতে পেরেছে নাকি?

কাট্।

বিধু : (সরলভাবে) তা কি ক'রে বলব ভাই? তবে গুজব শুনছি, কথাটা নাকি আর চাপা নেই।—অ্যাঁ? আরে না না, আমি কি কখনও বলতে পারি? হয় তো তোমার ছেলেই কাউকে চিঠিপত্র লিখেছিল—আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত আছ—আজ আসি তা হ'লে—

পরিতৃপ্তভাবে হাসিতে হাসিতে বিধু ফোন রাখিয়া দিলেন।

কাট্।

অত্যন্ত বিচলিতভাবে ফোন রাখিয়া প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চিন্তা-বন্ধুর ললাটে গালের আব্‌টি টিপিতে টিপিতে ঘরের মধ্যে কয়েকবার পাক খাইলেন। ম্যানেজার মিষ্টান্ন চিবাইতে চিবাইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিতেছিলেন; অবশেষে প্রশ্ন করিলেন—

ম্যানেজার : তা হ'লে মেয়ে দেখতে যাওয়াই স্থির।

প্রতাপ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; মেয়ে দেখার কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রতাপ : মেয়ে! থামুন মশাই, আগে ছেলে উদ্ধার করি, তারপর মেয়ে দেখব।

ম্যানেজারের চর্ব্বণ ক্রিয়া বন্ধ হইল, তিনি অনিমেষ নেত্রে প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ম্যানেজার : কি হয়েছে ছেলের ?

প্রতাপ ব্যাপারটাকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

প্রতাপ : হয় নি কিছু। তাকে এক জায়গায় বেড়াতে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সে জায়গা আর নিরাপদ নয়।

ম্যানেজারের চর্ব্বণ কার্য্য আবার সচল হইল। প্রতাপ দুশ্চিন্তায় চুলের মধ্য দিয়া আঙুল চালাইয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—

প্রতাপ : ভ্যালা ফ্যাঁসাদ! এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও তো—তাঁরাও গুটি গুটি ফিরে আসবেন! নাঃ, ছেলে বিয়ের যুগ্যি হওয়াও একটা ফ্যাঁসাদ দেখছি। কে জানে ছেলেটা এখন কি করছে? হয় তো—

ওয়াইপ্।

ঝাঝার উপকণ্ঠে একটি পার্ব্বত্য স্থান। অসমতল উপল বন্ধুর ভূমি; মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড়, শালের ঝোপ। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ধারা বিস্তীর্ণ বালুশয্যার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

একটি পাথরের স্তূপ বেশ উঁচু; তাহার চূড়া মাটি হইতে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চে। এই গিরিশৃঙ্গের উপর রঞ্জন অতি সাবধানে আরোহণ করিতেছিল। কিন্তু একা নয়। মঞ্জুও উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে দুরারোহ স্থানে পৌঁছিলে রঞ্জন হাত ধরিয়া মঞ্জুকে টানিয়া তুলিতেছিল।

অবশেষে প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছিয়া উভয়ে দেখিল আর ওঠা

যায়না ; তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহারা বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

উঁচু হইতে চারিদিকের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। রঞ্জন মুগ্ধভাবে বলিল—

রঞ্জন : কী চমৎকার! ঝাঝার এত কাছে যে এত সুন্দর জায়গা আছে তা আমি জানতুমই না—পাহাড়—জঙ্গল—আবার একটি ছোট্ট নদীও আছে।

রঞ্জনের মুগ্ধ ভাব দেখিয়া মঞ্জু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। রঞ্জন পিছনে তাকাইয়া দেখিল—পাহাড়ের গায়ে বেঞ্চির মত খাঁজকাটা বসিবার স্থান আছে।

রঞ্জন : বসুন!

উভয়ে পাশাপাশি বসিল।

রঞ্জন : বাস্তবিক কী নির্জ্জন জায়গা! এবার যখনই দেখব বাড়ীতে বিপদের সম্ভাবনা, এখানে পালিয়ে আস্‌ব।

মঞ্জু চকিতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইল।

মঞ্জু : বাড়ীতে বিপদ কিসের ?

রঞ্জন একটু অপ্রতিভ হইল।

রঞ্জন : না, এম্‌নি কথার কথা বলছি।—আপনি এখানে বেড়াতে আসেন না কেন ?

মঞ্জু বাহিরের দিকে তাকাইল ; তাহার চক্ষু ক্রমে স্বপ্নাতুর হইল।

মঞ্জু : প্রায়ই আসি—পাহাড়ে, জঙ্গলে, ঘোড়ের বালির ওপর ঘুরে বেড়াই।

রঞ্জনও চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাতুর করিয়া চাহিল।

রঞ্জন : এবার থেকে আমিও প্রায়ই আস্‌ব—পাহাড়ে জঙ্গলে নদীর চরে ঘুরে বেড়াব।

রঞ্জন মঞ্জুর পানে একবার আড়চক্ষে চাহিল।

রঞ্জন : কে বলতে পারে, ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হয় তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে।

মঞ্জু হাসি লুকাইল।

মঞ্জু : তারপর আমি মোটরে বাড়ী ফিরে যাব।

রঞ্জন : আমিও মোটর বাইকে বাড়ী ফিরে যাব।

উভয়ে নীচের দিকে তাকাইল। নীচে একটি সমতল স্থানে মঞ্জুর মোটর ও রঞ্জনের মোটর বাইক ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াইয়া আছে, যেন দুটির মধ্যে ভারী ভাব।

মঞ্জু ও রঞ্জন পরস্পরের পানে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এই সময় নিম্ন হইতে রাখালের বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল। দু'জনে চোখে চোখে চাহিয়া শব্দ শুনিল; তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

একপাল মহিষ দিনের চারণ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। সর্ব্বশেষ মহিষের পিঠের উপর বসিয়া একটি ক্ষুদ্র বালক বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে। রঞ্জন ও মঞ্জু পাশাপাশি বসিয়া বাঁশী শুনিতেছে। ক্রমে রঞ্জন গুন্ গুন্ করিয়া বাঁশীর সুর গুঞ্জন করিতে লাগিল, তারপর মৃদুস্বরে গাহিল—

রঞ্জন : "প্রাণের বাঁশী বাজাও তুমি কে?
কোথায় এমন সুর এলে শিখে?"

মঞ্জু গাহিয়া উত্তর দিল—

মঞ্জু : "ও যে ব্রজের রাখাল চরায় ধেনু
বাজায় বেণু গো—"

রঞ্জন নদীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া গাহিল—

রঞ্জন : "প্রেম-যমুনার তীরে তারে
দেখতে পেনু গো—"

মঞ্জু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

মঞ্জু : "এবার ঘরে ফেরার সময় হ'ল
চল্ রে সেই দিকে।"

রঞ্জনও উঠিয়া দাঁড়াইল—

রঞ্জন : "আজ ঘর ভুলেছি বাঁশীর তানে
বনের অস্তিকে।"

মহিষপাল গোধূলি আলোর ভিতর দিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। বাঁশী বাজিতেছে। মঞ্জু ও রঞ্জনের কণ্ঠস্বর বাঁশীর সুরে মিশিতেছে।

ফেট আউট্।

ফেড ইন্।

ঝাঝায় একটি বাড়ীর সম্মুখস্থ ঢাকা বারান্দা। একটি ডেক্ চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া একটি টুলের উপর পা তুলিয়া দিয়া ইন্দু নভেল পড়িতেছে। তাহার বেশবাশ ও কেশপাশ অযত্ন বিন্যস্ত।

নভেল পড়িতে পড়িতে পাশের একটি বেতের টেবিলের উপর হইতে চকোলেট লইয়া মুখে পুরিয়া ইন্দু চিবাইতে লাগিল। ইন্দুর মাতা আসিয়া ইতিমধ্যে একটি বেতের চেয়ারের মাথা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং মুখে ভর্ৎসনা ও বিরক্তি মিশাইয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা স্থূলাঙ্গী গৃহকর্ত্রী।

কর্ত্রী : কেদারায় গা এলিয়ে নভেল পড়লেই চল্‌বে ? এই জন্যেই বুঝি এখানে আসা হয়েছে ?

ইন্দু মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল, তাহার মুখেও বিরক্তি ও বিদ্রোহ সুপরিস্ফুট

ইন্দু : তা—আর কী করব বলে দাও—

হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহকর্ত্রী বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কর্ত্রী : তোকে নিয়ে আমি যে কি করি ইন্দু, ভেবে পাই না। একটু গা নাড়বি না—কেবল আলিস্যি আর নভেল পড়া। বলি, দায় কি শুধু আমারই ? বিয়ে করবে কে ? তুই—না আমি ?

ইন্দু রুক্ষস্বরে উত্তর দিল—

ইন্দু : তা কি জানি—তুমিই বল্‌তে পার।

কর্ত্রী : ইন্দু—

ইন্দু মাতার বিমূঢ় বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া আর থাকিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া মুখে বই চাপা দিল। রাগের মাথায় সে যাহা বলিয়াছিল তাহার যে একটা হাস্যকর দিক আছে তাহা সে পূর্ব্বে খেয়াল করে নাই।

কর্ত্রী : আবার হাসি ! আজকালকার মেয়েরা সত্যি বেহায়া বাপু। ও কথা বল্‌তে তোর মুখে বাধ্‌ল না ?

ইন্দু আবার উদ্ধত স্বরে জবাব দিল—

ইন্দু : বাধ্‌বে কোন দুঃখে ! তোমরাই তো আমাদের বেহায়া করে তুলেছ ; নইলে একটা পুরুষমানুষের পেছনে ছুটে বেড়াতে আমার কি লজ্জা হয় না ?

কর্ত্রী : বোকার মত কথা বলিস নি ইন্দু। ছুটে বেড়াতে বলি কি সাধে। ওর বাপের যে লক্ষ লক্ষ টাকা ; বিয়ে হলে সব যে তোর হবে। এতটুকু নিজের ইষ্ট বুঝতে পারিস নে ?

ইন্দু সশব্দে বই বন্ধ করিল।

ইন্দু : খুব পারি। কিন্তু যে লোক পালিয়ে বেড়ায়, তার পেছনে ছুটে বেড়াতে নিজের ওপর ঘেন্না হয়।

কর্ত্রী : (ধমক দিয়া) ঘেন্না আবার কিসের ! সবাই করছে। এই যে মীরার মা, মলিনার মা, সলিলার মা, সবাই এসে জুটেছে —সে কি হাওয়া বদ্‌লাবার জন্যে ? সকলের মৎলব রঞ্জনকে হাত করা।

ইন্দু বই খুলিয়া বসিল।

ইন্দু : যা ইচ্ছা করুক তারা ; আমি পারব না।

কর্ত্রী : আবার বই খুললি ? পারি নে বাপু ! (মিনতির সুরে) নে উঠ—লক্ষ্মীটি, তাড়াতাড়ি সাজ-গোজ করে বের হ। কী হয়ে রয়েছিস বল্‌ দেখি ? চুলগুলো একমাথা—মা গো মা !

ইন্দু : কোথায় যেতে হবে শুনি ?

কর্ত্রী : তা—বেড়াতে বেড়াতে না হয় রঞ্জনের বাড়ীর দিকেই যা না—হয় তো সে—

ইন্দু : বলেছি তো বাড়ীতে থাকে না—দুবার গিয়ে ফিরে এসেছি।

গৃহকর্ত্রী ইন্দুর হাত ধরিয়া একটু নাড়া দিলেন।

কর্ত্রী : তা হোক ; তুই এখন ওঠ তো। কে বলতে পারে হয় তো রাস্তাতেই দেখা হ'য়ে যাবে।

ইন্দু : (মুখ বিকৃত করিয়া) হ্যাঁ—হয় তো দেখবো মীরা কি মলিনা আগে থাকতেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

কর্ত্রী : তা হ'লে তুইও সেই সঙ্গে জুটে যাবি। আর কিছু না হোক, ওরা তো কিছু করতে পারবে না ; সেটাই কি কম লাভ ? নে, আর দেরী করিস নি।

ইন্দু বইখানা বিরক্তিভরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু : বেশ, যা বল করছি। মান ইজ্জৎ আর রইল না—

সে রাগে গাল ফুলাইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল ! গৃহকর্ত্রী তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজ মনেই বলিলেন—

কর্ত্রী : মান ইজ্জৎ। কথা শোনো না, টাকার কাছে মান ইজ্জৎ !

কাট্।

ঝাঝার বাজারের পাশে একটা আম বাগান। মিহির এই বাগানের একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়া একান্তমনে কাঠ্-বিড়ালীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল ; বোধ্ হয় ফটো তুলিবার ইচ্ছা।

একটি যুবতী মিহিরের পিছন দিকে প্রবেশ করিলেন। ইনি মলিনা। পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তিনি পিছন হইতে মিহিরের চোখ টিপিয়া ধরিলেন। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—

মলিনা : বলুন তো আমি কে?

মিহির ত্বরিতে নিজের চোখের উপর হইতে মলিনার হাত সরাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইল; তারপর তাহার সন্ত্রস্ত মুখে হাসি দেখা দিল। সে মলিনার দিকে ঘুরিয়া বসিল।

মলিনার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল; সে থতমত খাইয়া বলিল—

মলিনা : ওঃ মাফ করবেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি রঞ্জনবাবু—

মিহিরের আনন্দ কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। মলিনা পিছু হটিতে লাগিল।

মিহির : না—আমার নাম মিহিরনাথ মণ্ডল—রঞ্জনবাবু এখানে নাই।

মলিনা : মাফ করবেন—

চলিয়া যাইতে যাইতে মলিনা দ্বিধাভরে দাঁড়াইল।

মলিনা : আপনি—রঞ্জনবাবুকে চেনেন?

মিহির উঠিয়া মলিনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিহির : চিনি বৈকি। আপনি কি তাঁর কেউ?

মলিনা : বান্ধবী। তাঁকে কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?

মিহির : এই তো খানিকক্ষণ হল তিনি ফট্‌ফট্‌ করে এদিক দিয়ে নদীর দিকে বেড়াতে গেলেন।

মলিনা : ও। তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল বুঝি ?

মিহির : কেউ না—একলা। কী ব্যাপার বলুন দেখি ? কালকেও একটি অপরিচিতা তরুণী আমাকে এই কথাই জিগ্যেস করছিলেন।

মলিনা সচকিতে মিহিরের পানে তাকাইল।

মলিনা : তাই না কি ?

মিহির : হ্যাঁ। তাঁকেও বললুম—রঞ্জনবাবু তো প্রায়ই নদীর ধারে বেড়াতে যান।

মলিনা একটু চিন্তা করিল।

মলিনা : হুঁ নদীর ধারটা কোন দিকে ?

মিহির সোৎসাহে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

মিহির : ঐ দিকে। এই যে রাস্তাটা ঐ দিকেই গিয়েছে। ভারি সুন্দর যায়গা, পাহাড়, বন, নদী। যাবেন সেখানে ? বেশ ত চলুন না—

মলিনা : ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব।

মিহিরের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মলিনা চলিয়া গেল। মিহির একটু নিরাশভাবে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

ঝাঝার উপকণ্ঠস্থ পার্ব্বত্য ভূমি। মঞ্জুর মোটর পূর্ব্বে যেখানে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়া। গাড়ী শূন্য ; কাছে পিঠে কেহ নাই।

ফট্‌ফট্‌ শব্দ হইল ; রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া মঞ্জুর মোটরের পাশে দাঁড়াইল। রঞ্জন অবতরণ করিয়া উৎসুকভাবে চারিদিকে তাকাইল, কিন্তু ঈপ্সিত মূর্ত্তিটিকে দেখিতে পাইল না। রঞ্জন মনে মনে একটু হাসিল ; তারপর মুখে আঙুল দিয়া দীর্ঘ শিস্‌ দিল। শিস্‌ দিয়া উৎকণ্ঠ হইয়া রহিল—কোন্‌ দিক হইতে উত্তর আসে !

দুইটি মানুষ যখন পরস্পর ভালবাসিয়া ফেলে তখন তাহাদের মধ্যে আদৌ খেলার অভিনয় চলিতে থাকে। এই জন্যই বোধ হয় 'রস' 'ক্রীড়া' 'কেলি' প্রভৃতি শব্দগুলি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মঞ্জু কিছু দূরে একটা বড় পাথরের চ্যাঙড়ের আড়ালে লুকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল ; এখন একবার সতর্কভাবে ওধারে উঁকি মারিবার চেষ্টা করিল। তারপর দুই করতল শঙ্খের আকারে মুখের কাছে লইয়া গিয়া দীর্ঘ টু দিল।

মঞ্জু : টুউউউ—!

টু দিয়াই সে দেহ ঝুঁকাইয়া ক্ষিপ্রচরণে পাথরের আশ্রয় ছাড়িয়া সম্মুখ দিকে পলায়ন করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রঞ্জন আসিয়া প্রবেশ করিল ; কিন্তু কেহ কোথাও নাই। রঞ্জন একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছে এমন সময় দূর হইতে আবার মঞ্জুর টু আসিল। রঞ্জনের

মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে একটু চিন্তা করিল; তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল।

মঞ্জু আর একটা পাথরের তলায় গিয়া লুকাইয়া বসিয়াছিল। হাঁটু পর্য্যন্ত উলুবন; পাথরটাও বেশী উঁচু নয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথা দেখা যাইবে। মঞ্জু রঞ্জনের পদধ্বনি শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কিছু শুনিতে না পাইয়া সে উল্টা দিকে ফিরিয়া অবনতভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। পাথরের আড়ালে আড়ালে কিছুদূর গিয়া যেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেখিল ঠিক সম্মুখেই পাথরে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জন গম্ভীরভাবে সিগারেট ধরাইতেছে।

মঞ্জু চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

রঞ্জন সিগারেট ধরাইয়া ধীরে-সুস্থে তাহার অনুসরণ করিল।

নদীর বালুর উপর দিয়া মঞ্জু ক্রীড়া-চপলা বালিকার মত হাসিতে হাসিতে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিতেছে। অবশেষে জলের নিকটবর্ত্তী ভিজা বালুর উপর পৌছিয়া সে বসিয়া পড়িল; তারপর দুহাত দিয়া ভিজা বালু খুঁড়িয়া বালির ঘর তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এইখানে নদীটি প্রায় বিশ হাত চাওড়া, জলের উপর সম-ব্যবধানে কয়েকটি বড বড় পাথরের চাঁই বসাইয়া পারাপারের ব্যবস্থা হইয়াছে। জল অবশ্য গভীর নয়; কিন্তু জলে না নামিয়া তাহা অনুমান করা যায় না।

রঞ্জন আসিয়া মঞ্জুর পিছনে দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

রঞ্জন : ওটা কি হচ্চে ?

মঞ্জু একবার উপর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া আবার বালু খনন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল—

মঞ্জু : ঘর তৈরি হচ্চে। আপনিও আসুন না, দেখি কেমন ঘর তৈরি করতে পারেন।

রঞ্জন ঘুরিয়া গিয়া মঞ্জুর সম্মুখে বালুর উপর পা ছড়াইয়া বসিল; বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—

রঞ্জন : মেয়েদের ঐ এক কাজ—ঘর তৈরি করা, আর ঘর তৈরি করা।

মঞ্জুর ঘর তখন প্রায় শেষ হইয়াছে; সে ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিল—

মঞ্জু : আর পুরুষদের কাজ বুঝি ঘর ভাঙা, আর ঘর ভাঙা ?

রঞ্জন উত্তর দিল না; সিগারেট টানিয়া আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। তাহার চোখ ও অধর-কোণে দুষ্টামি ঝিলিক মারিয়া উঠিল। সে সরলভাবে মঞ্জুর দিকে দৃষ্টি নামাইয়া প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন : তোমার বাড়ীতে ক'টি ঘর ?

মঞ্জু : একটি—কেন ?

রঞ্জন দুষ্টামি-ভরা চক্ষু আবার আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—

রঞ্জন : না কিছু না—এম্‌নি জিগ্যেস করছিলুম।

মঞ্জু কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিল।

মঞ্জু : কী কথাটা, শুনিই না।

রঞ্জন : নাঃ—কিচ্ছু না—

বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মঞ্জু দ্রুত একমুঠি ভিজা বালি তুলিয়া লইয়া রঞ্জনকে ছুঁড়িয়া মারিল। রঞ্জন টপ্ করিয়া মাথা সরাইয়া আত্মরক্ষা করিল; তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—

মঞ্জু : হাসি হচ্ছে কেন? নিজে বাড়ী তৈরি করতে পারেন না তাই আমার বাড়ী দেখে ঠাট্টা হচ্চে?

হাস্য সম্বরণ করিয়া রঞ্জন মাথা নাড়িল।

রঞ্জন : উঁহু—

মঞ্জু : তবে? দেখি না কেমন ঘর তৈরি করতে পারেন। আমার চেয়ে ভাল ঘর তৈরি করুন তবে বুঝব।

রঞ্জন : আমি আলাদা ঘর তৈরি করছি না—

মঞ্জু : তবে?

রঞ্জন : তোমার ঘর তৈরি হলে তাইতে ঢুকে পড়ব।

খেলাঘরের ঝগড়ার ভিতর দিয়া রঞ্জনের কথার ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহা মঞ্জু বুঝিতে পারে নাই। কপট যুযুৎসায় সেও আর একমুঠি বালি তুলিয়া লইয়া বলিল—

মঞ্জু : ইঃ—! আসুন না দেখি! আমি ঢুকতে দিলে তো! আমার দুর্গ আমি প্রাণপণে রক্ষা করব।

রঞ্জন কিন্তু দুর্গ আক্রমণের কোনও চেষ্টা করিল না; হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মঞ্জুর দিকে একটু ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন: মঞ্জু, মনে কর আমার বাড়ী নেই; আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে তোমার কি আপত্তি হবে?

মঞ্জু বালুমুষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য উর্দ্ধে তুলিয়াছিল, সেগুলি ঝরিয়া তাহার কাপড়ের উপর পড়িল। তাহার গাল দুটি তপ্ত হইয়া উঠিল; সে মাথা হেঁট করিয়া কাপড় হইতে বালি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন: মঞ্জু—

মঞ্জুও উঠিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

রঞ্জন: কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবার চেষ্টা করছি—

মঞ্জু তাহার সলজ্জ চোখ দুটি রঞ্জনের বুক পর্য্যন্ত তুলিয়াই আবার নত করিয়া ফেলিল, চুপি চুপি বলিল—

মঞ্জু: খুব গোপনীয় কথা বুঝি?

রঞ্জন: হ্যাঁ। বলব?

মঞ্জু ভালমানুষের মত বলিল—

মঞ্জু: বলুন না—এখানে তো কেউ নেই—

বলিয়া স্থানটির জনশূন্যতার প্রতি রঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই যেন পাশের দিকে চোখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুদাহতের মত হাত ছাড়াইয়া সে পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জনও ঘাড় ফিরাইল।

যেখানে নদীর বালু শেষ হইয়াছে তাহারই কিনারায় একটি গাছে আলস্যভরে ঠেস্ দিয়া একটি তরুণী দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন। এখন তিনি একটি ক্ষুদ্র গাছের শাখা বাঁ হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মঞ্জু ও রঞ্জনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মঞ্জু ও রঞ্জন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। রঞ্জনের মুখে অস্বস্তি ও বিরক্তি সুপরিস্ফুট; তরুণীটি যে তাহার পূর্ব্বপরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্জু চকিতের ন্যায় তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রঞ্জনের প্রতি একটি কুটীল ভ্রূবিন্যাস করিয়া বলিলেন—

মীরা: কী রঞ্জনবাবু? আমাকে চিনতে পারছেন না নাকি?

রঞ্জন: (চমকিয়া) না না, চিন্‌তে পারছি বৈকি মীরা দেবী। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম আপনাকে দেখে। ইয়ে—(পরিচয় করাইয়া দিল) ইনি মঞ্জু দেবী—মীরা দেবী—

যুবতীদ্বয় কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া শুধু একবার ঘাড় ঝুঁকাইলেন। মীরা একটু বাঁকা সুরে রঞ্জনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—

মীরা: আমিও কম আশ্চর্য্য হই নি আপনাকে দেখে—

রঞ্জন লাল হইয়া উঠিয়া কাশিল।

মীরা : কে ভেবেছিল যে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন—

রঞ্জন : না না, লুকিয়ে আর কি—

মঞ্জুর মুখ গাম্ভীর্য্যে রাহুগ্রস্ত। সে রঞ্জনকে বলিল—

মঞ্জু : দেরী হয়ে যাচ্ছে ; এবার বাড়ী ফেরা উচিত।

রঞ্জন যেন কূল পাইল ; সোৎসাহে বলিল—

রঞ্জন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় বাড়ী ফেরা দরকার। কেদারবাবু হয় তো কত ভাবছেন।—(মীরাকে) আচ্ছা তাহলে—

মীরা আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিল।

মীরা : কৈ, এখনও তো দিব্যি আলো রয়েছে ; ছটাও বাজে নি বোধ হয়। এত শিগ্‌গির বাড়ী ফেরা তো আপনার অভ্যেস নয় রঞ্জনবাবু—

মীরা মুচকি হাসিয়া তারপর মঞ্জুর পানে নিরুৎসুক ভাবে তাকাইয়া বলিল—

মীরা : কিন্তু আপনার যদি দেরী হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে আট্‌কাবো না।—আসুন রঞ্জনবাবু, ঐ দিকটা খানিক বেড়ানো যাক। কী সুন্দর যায়গা!

মঞ্জুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে মনের ভাব জোর করিয়া চাপিয়া শুষ্কস্বরে বলিল—

মঞ্জু : আচ্ছা চললুম।

মঞ্জু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রঞ্জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে বুঝি তাহার অনুসরণ করিবে ; কিন্তু মীরার মধুঢালা কণ্ঠস্বর

তাহাকে পা বাড়াইতে দিল না। সে কেবল দুই চক্ষে আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া যেদিকে মঞ্জু গিয়াছে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

মীরা : কলকাতার কত যায়গায় আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন রোমান্টিক কোথাও পাই নি---

মীরা রঞ্জনের বাম বাহুর সহিত নিজ দক্ষিণ বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে একটা নাড়া দিল।

মীরা : না রঞ্জনবাবু ?

রঞ্জন চমকিয়া মীরার দিকে মুখ ফিরাইল।

রঞ্জন : হ্যাঁ—না—মানে—

দ্রুত ডিজল্‌ভ্।

মঞ্জু মোটর চালাইয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। গাড়ী প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছে। মঞ্জুর চোখের দৃষ্টি স্থির, ঠোঁট দুটি চাপা ; সে প্রয়োজন মত গাড়ীর কলকব্জা নাড়িতেছে, কখনও হর্ণ বাজাইতেছে ; কিন্তু তাহার মন যে আজিকার ঘটনায় একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যায়।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং রুম। মঞ্জু পিয়ানোয় বসিয়া উদাস কণ্ঠে গান গাহিতেছে ; তাহার দৃষ্টি জানালার দিকে যাইতে যাইতে

পথে রঞ্জনের ছবিটার কাছে আটকাইয়া যাইতেছে, কিন্তু মুখের বিষণ্ণতা দূর হইতেছে না।

মঞ্জু : "ঘন বাদল আসে কেন গগন ঘিরে ?
কেন নয়ন ভাসে সখি নয়ন নীরে !
ছিল উজল শশী মেঘে পড়িল ঢাকা—
কালো কাজল মসী এল মেলিয়া পাখা—
মোর তরণীখানি বুঝি ডুবিল তীরে।"

এতক্ষণ আমরা মঞ্জুকেই দেখিতেছিলাম ; কেদারবাবু যে ঘরে আছেন তাহা লক্ষ্য করি নাই। কেদারবাবু চোখে চশমা লাগাইয়া একটা মোটা বই পড়িতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া চশমার উপর দিয়া মঞ্জুর প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মঞ্জুর মনে যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

গান শেষ হইলে মঞ্জু পিয়ানোর দিকে পাশ ফিরিয়া গালে হাত দিয়া বসিল। কেদারবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন, সহসা প্রশ্ন করিলেন—

কেদার : আজ বেড়াতে যাবি না ?

মঞ্জু হাত হইতে মুখ তুলিল।

মঞ্জু : (নিরুৎসুক) বেড়াতে ? কি জানি—

কেদার হাতের বই বন্ধ করিয়া চশমার উপর দিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন—

কেদার : কী হয়েছে ? শরীর খারাপ ?

মঞ্জু উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু : না—কিছু নয়—

কেদার গলার মধ্যে হুঙ্কার করিলেন।

কেদার : হুঁ:। তবে বেড়িয়ে এসো—

বই খুলিয়া পড়িতে গিয়া তিনি আবার মুখ তুলিলেন।

কেদার : সে ছোকরা—কি নাম? রঞ্জন!—কৈ আজকাল তো আর আসে না। চলে গেছে নাকি?

মঞ্জু বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মাথা নাড়িল।

মঞ্জু : না—

কেদার : তবে আসে না কেন?

মঞ্জু : (পূর্ব্ববৎ) জানি না—

কেদার এবার তাঁহার চশমা কপালের উপর তুলিয়া দিলেন, ভাল করিয়া মঞ্জুকে নিরীক্ষণ করিয়া আবার চশমা নাকের উপর নামাইয়া দিয়া একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার দিলেন।

কেদার : হুঁ:। তুমি এখন একটু বেড়িয়ে এসো। আর, যদি 'দৈবাৎ' সে ছোকরার সঙ্গে দেখা হয়, তাকে আসতে বোলো? তাকে আমার বেশ লাগে—হুঁ:।

কেদার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। মঞ্জু একটু ইতস্তত করিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য গমনোদ্যত হইল।

ডিজল্‌ভ্।

পার্ব্বত্য ভূমির যে-স্থানে মঞ্জু ও রঞ্জনের গাড়ী আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিত, সেখানে কেবল রঞ্জনের মোটর বাইক নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

রঞ্জন কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সপ্রশ্ন নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শেষে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়া সাঙ্কেতিক শিষ্ দিল। কিন্তু কোন দিক হইতেই উত্তর আসিল না।

রঞ্জন প্রথম দিন যে পাথরের স্তম্ভের মাথায় উঠিয়াছিল সেইদিকে দৃষ্টি তুলিল কিন্তু সেখানে কেহ নাই। রঞ্জন নদীর দিকে চলিল।

নদীতীর জনশূন্য ; সেখানে মঞ্জু নাই।

রঞ্জন চিন্তিত মুখে সেখান হইতে ফিরিল। যে পাথরের ঢিবির পশ্চাতে মঞ্জু লুকাইয়া লুকোচুরি খেলার অভিনয় করিয়াছিল তাহাতে কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া রঞ্জন ভাবিতে লাগিল।

কিছু দূরে একটা ঝোপের মত ছিল ; ঘন আগাছা ও কাঁটা গাছ মিলিয়া খানিকটা স্থান বেড়ার মত আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সেই বেড়া ফাঁক করিয়া একটি যুবতী উঁকি মারিল। যুবতীটি মলিনা। ক্ষণেক নিঃশব্দে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া মলিনা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রঞ্জনের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। কী হইল? মঞ্জু আজ আসিল না কেন? সহসা তাহার দুশ্চিন্তা জাল ছিন্ন করিয়া ঝোপের অন্তরাল হইতে রমণী কণ্ঠের উচ্চ কাতরোক্তি কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া রঞ্জন মুখ তুলিল। তারপর দ্রুত ঝোপের কাছে গিয়া কাঁটা গাছ দু'হাতে সরাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

কাট্‌।

যেখানে রঞ্জনের মোটর-বাইক দাঁড়াইয়াছিল, মঞ্জুর গাড়ী সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। একটু দূরে গাড়ী দাঁড় করাইয়া মঞ্জু গাড়ী হইতে নামিল, নিরুৎসুকভাবে এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর মন্থরপদে নদীর দিকে চলিল।

কাট্‌।

ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রঞ্জন দেখিল অদূরে একটি গাছের তলায় একটি যুবতী পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রঞ্জন : এ কি! মলিনা দেবী—!

মলিনা কাতরভাবে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল—

মলিনা : রঞ্জনবাবু! আপনি! উঃ—!

রঞ্জন একটু ইতস্তত করিয়া মলিনার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

রঞ্জন : কি হয়েছে?

মলিনা : বেড়াতে এসেছিলুম—হঠাৎ পড়ে গিয়ে পা মুচ্‌কে গেছে—

যেন যন্ত্রণা চাপিবার জন্য মলিনা অধর দংশন করিল।

রঞ্জন : তাই তো—কোনখানটা—দেখি?

পায়ের গোছের উপর হইতে শাড়ীর প্রান্ত সরাইয়া রঞ্জন চরণ দুটি পর্য্যবেক্ষণ করিল, কিন্তু কোথাও স্ফীতির লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

রঞ্জন : কোন্ পায়ে ?

মলিনা : (মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিয়া তাড়াতাড়ি) বাঁ পায়ে।

রঞ্জন : এইখানে ? লাগছে ?

তর্জ্জনী দিয়া রঞ্জন পায়ের আহত স্থানটা টিপিয়া দিতেই মলিনা জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রঞ্জন দ্রুত আঙুল টানিয়া লইল।

কাট্।

মঞ্জু ইতিমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ঝোপের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছিল ; ঝোপের অভ্যন্তরে চীৎকার শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; বিস্মিতভাবে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া মঞ্জু দ্বিধা-শঙ্কিত ভাবে ঝোপের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কাট্।

ওদিকে রঞ্জন রুমাল বাহির করিয়া মলিনার পায়ের গোছ বাঁধিয়া দিতেছে ; মলিনা সময়োচিত ক্লিষ্ট মুখভঙ্গী করিয়া যেন যন্ত্রণা অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঁধা শেষ করিয়া রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন : এবার দেখুন তো উঠ্‌তে পারেন কিনা—

মলিনা উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মলিনা : আপনি সাহায্য করুন, নইলে উঠ্‌তে পারব না—

রঞ্জন উদ্বিগ্নভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন : আমি—সাহায্য—! আচ্ছা—

রঞ্জন মলিনার একটা বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল।

মলিনা : না, না, ও রকম করে নয়। আপনি হাঁটু গেড়ে বসুন—এইখানে—

মলিনা নিজের পাশে হাঁটু গাড়িবার স্থান নির্দ্দেশ করিল। ঘাতকের খড়্গের সম্মুখে আসামীকে হাঁটু গাড়িতে বলিলে তাহার মুখের ভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ মুখ লইয়া রঞ্জন মলিনার পাশে নতজানু হইল।

মলিনা তাহার বাম বাহুটি রঞ্জনের কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া বলিল—

মলিনা : এইবার আপনি উঠুন—

রঞ্জন উঠিল ; সেইসঙ্গে মলিনাও দাঁড়াইল।

একজন ঝোপ ফাঁক করিয়া যে এই পরম ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটি লক্ষ্য করিতেছে তাহা ইহারা দেখিতে পাইল না। মঞ্জুর মুখ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি কঠিন। সে আর দাঁড়াইল না ; হাত সরাইয়া লইতেই ঝোপের ডালপালা তাহাকে আড়াল করিয়া দিল।

এদিকে রঞ্জন গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, টানাটানি করিয়া নয়, বিনীত শিষ্টতার সহিত।

রঞ্জন : এবার বোধ হয় আপনি দাঁড়াতে পারবেন—

মলিনা : দাঁড়াতে হয় তো পারি, কিন্তু একলা হাঁটতে পারব না। বাড়ী যেতে হবে তো। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন ; নৈলে কি করে যে বাড়ী যেতুম—

এইভাবে বাড়ী যাইতে হইবে শুনিয়া রঞ্জন ঘামিয়া উঠিল। ক্ষীণস্বরে বলিল—

রঞ্জন : অ্যা—বাড়ী—! কিন্তু—

কিন্তু মলিনার বাহুবন্ধন শিথিল হইল না। হতাশভাবে রঞ্জন তদবস্থায় সম্মুখ দিকে পা বাড়াইল।

কাট্।

পূর্ব্বোক্ত স্থানে মঞ্জুর মোটর ও রঞ্জনের বাইক দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্জু দ্রুতপদে, প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ করিল; গাড়ীর চালকেব আসনে বসিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জন ও তাহার কণ্ঠলগ্ন মলিনাকে আসিতে দেখা গেল। দূর হইতে মোটর-বাইক দেখিতে পাইয়া মলিনা বলিল—

মলিনা : ওটা বুঝি আপনার মোটর বাইক ?

রঞ্জন : হ্যাঁ—

মলিনা : ভালই হল। আপনি গাড়ী চালাবেন, আর আমি আপনার কোমর ধরে পেছনে বস্ব—

চিত্রটি মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়া রঞ্জনের হাত-পা শিথিল হইয়া গেল। মলিনা আর একটু হইলেই পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত রঞ্জনের গলা চাপিয়া ধরিয়া পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল।

ডিজল্ভ্।

ঝাঝার একটি পথ। মিহির পথের মাঝখান দিয়া চলিয়াছে; তাহার অবিচ্ছেদ্য ক্যামেরাটি অবশ্য সঙ্গে আছে।

পিছনে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া মিহির পিছু ফিরিয়া তাকাইল; তারপর তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বাহির করিতে করিতে রাস্তার একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জনের মোটর বাইক আসিতেছে দেখা গেল। রঞ্জন গাড়ী চালাইতেছে; মলিনা তাহার কোমর জড়াইয়া পিছনে বসিয়া আছে। মলিনার মুখ মিহিরের দিকে। মোটর বাইক সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেই মিহির টক্ করিয়া ফটো তুলিয়া লইল।

মোটর বাইক চলিয়া গেল। মিহির ক্যামেরা হইতে মুখ তুলিল। তাহার মুখে সার্থকতার হাসি ক্রীড়া করিতেছে।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। সিঁড়ির উপর মঞ্জু একাকিনী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। মুখে প্রফুল্লতা নাই; চোখের পাতা যেন একটু ফুলিয়াছে, দেখিলে সন্দেহ হয় লুকাইয়া কাঁদিয়াছে! তাহার প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল ও দৃঢ়; কিন্তু আজ তাহাকে কিছু বেশী রকম বিমর্ষ দেখাইতেছিল।

সম্মুখে ফটকের দিকে উন্মনাভাবে তাকাইয়া মঞ্জু বসিয়াছিল। চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে তাহার চোখে সচেতনা ফিরিয়া আসিল; যেন ফটক দিয়া কেহ প্রবেশ করিতেছে। সে চেষ্টা করিয়া মুখে একটু স্বাগত হাসি আনিয়া বলিল—

মঞ্জু: আসুন মিহিরবাবু!

কবি-প্রকৃতি মিহির মঞ্জুর মুখের ভাবান্তর কিছুই দেখিতে পাইল না; এক গাল হাসিয়া মঞ্জুর পাশে সিঁড়ির উপর আসিয়া বসিল; পকেটে হাত পুরিয়া কয়েকখানা পোস্টকার্ড আয়তনের ফটোগ্রাফ বাহির করিতে করিতে বলিল—

মিহির: কয়েকখানা স্ন্যাপ্-শট্ তুলেছি। দেখুন দিকি, কার সাধ্য বলে জাপানী ছবি নয়—

ছবিগুলি হাতে লইয়া মঞ্জু একে একে দেখিতে লাগিল। প্রথম ছবিটি নৃত্যরত সাঁওতাল মিথুনের। ছবিটি উপর হইতে সরাইয়া নীচে রাখিয়া মঞ্জু দ্বিতীয় ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

এটিতে রঞ্জন ও ইন্দু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নেপথ্যে সাঁওতাল-নৃত্য দেখিতেছে। মঞ্জু বেশ কিছুক্ষণ ছবিটার পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর ইন্দুকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—

মঞ্জু: ইনি কে?

মিহির গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—

মিহির: আমি চিনি না; বোধ হয় রঞ্জনবাবুর বান্ধবী—

মঞ্জু তিক্ত হাসিল।

মঞ্জু: রঞ্জনবাবুর অনেক বান্ধবী আছেন দেখছি—

ছবিটা তলায় রাখিয়া মঞ্জু তৃতীয় ছবি দেখিল। একটি ছাগল দেয়ালে সম্মুখের দুটি পা তুলিয়া দিয়া প্রাংশুলভ্য লতার পানে গলা বাড়াইয়াছে। সেটি অপসারিত করিয়া পরবর্ত্তী ছবির উপর দৃষ্টি পড়িতেই মঞ্জু শক্ত হইয়া উঠিল। মোটর বাইকে রঞ্জন ও মলিনা।

দেখিতে দেখিতে মঞ্জুর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

মঞ্জু: নির্লজ্জ!

মিহির ভুল বুঝিয়া বলিল—

মিহির: অ্যাঁ! হ্যাঁ—নির্লজ্জ বই-কি। নির্লজ্জতাই হচ্ছে আর্টের লক্ষণ—

মঞ্জু: নিন্ আপনার আর্ট, আমি দেখতে চাই না—

ছবিগুলি সক্রোধে ফিরাইয়া দিয়া মঞ্জু অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় কেদারবাবু পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হাতে লাঠি, বাহিরে যাইবার সাজ। মঞ্জু তাঁহার পদশব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। মিহির ছবিগুলি হাতে লইয়া বোকার মত বসিয়াছিল, সেও সেগুলি পকেটে পূরিতে পূরিতে দাঁড়াইয়া উঠিল।

মঞ্জু: বাবা, বেরুচ্ছ নাকি?

কেদার: হ্যাঁ, একবার ডাক্তারের বাড়িটা ঘুরে আসি। দাঁতের ব্যথাটা আবার যেন ধরব-ধরব করছে।

মঞ্জু: তা হেঁটে যাবে কেন? দাঁড়াওনা আমি গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিচ্ছি—

কেদার: হুঁঃ—গাড়ী! আমি হেঁটেই যাব—এইটুকু তো রাস্তা—

সিঁড়ি দিয়া নামিতে উদ্যত হইয়া তিনি থামিলেন।

কেদার : তুই আজ বেড়াতে গেলি নে ?

মঞ্জু মুখ-অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে তাকাইল। তারপর হঠাৎ মিহিরের দিকে সচকিতে চাহিয়া সে চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মঞ্জু : বেড়াতে ! হ্যাঁ—যাব।—মিহিরবাবু, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি গাড়ী বের ক'রে নিয়ে আসি ; আপনিও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন—

মঞ্জু দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। কেদারবাবু বিস্মিত-ভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর চিন্তিতভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। মিহির অবাক হইয়া বোকাটে মুখে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাইতে লাগিল।

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

ফটকের সম্মুখে মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; চালকের আসনে মঞ্জু। সে দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—

মঞ্জু : আসুন মিহিরবাবু—

মিহির বিহ্বলভাবে মঞ্জুর পাশে গিয়া বসিল।

মঞ্জুর মুখ কঠিন ; সে গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

এমন সময় পিছনে ফট্‌ফট্‌ শব্দ। পরক্ষণেই রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইল। রঞ্জন গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল—

রঞ্জন : মঞ্জু !

মাথা একটু নীচু করিতেই তাহার চোখে পড়িল মিহির মঞ্জুর পাশে বসিয়া আছে ; রঞ্জন থামিয়া গেল।

মঞ্জুর কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না ; সে উপেক্ষাভরে একবার রঞ্জনের দিকে তাকাইয়া গাড়ীর কলকব্জা নাড়িয়া গাড়ী চালাইবার উপক্রম করিল। রঞ্জন আগ্রহসংহৃতকণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন : মঞ্জু, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যভরে মঞ্জু মুখ তুলিল।

মঞ্জু : আমার সঙ্গে আবার কি কথা !

মঞ্জুর গাড়ী চলিয়া গেল।

রঞ্জন বিস্মিত ও আহতভাবে সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কেদারবাবু আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন ; রঞ্জন জানিতে পারিল না। কেদারবাবু তীক্ষ্ণচক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, যে পথে মঞ্জুর গাড়ী চলিয়া গিয়াছিল সেই পথে তাকাইলেন, তারপর গলার মধ্যে একটি হুঙ্কার ছাড়িলেন।

কেদার : হুঁঃ—

রঞ্জন চমকিয়া পাশের দিকে তাকাইল।

কেদার : ওরা চলে গেল ?

রঞ্জন : আজ্ঞে হ্যাঁ—

সে নিজের মোটর বাইকের কাছে গিয়া আরোহণের উদ্যোগ করিল। কেদারবাবু অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রঞ্জন গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

কেদার: ওহে শোন—

রঞ্জন ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া কেদারবাবুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

রঞ্জন: আজ্ঞে?

কেদার: তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

রঞ্জন। আঁজ্ঞে বলুন।

কেদারবাবু বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, একটু চিন্তা করিলেন।

কেদার: আজ নয়—আজ আমি একটু ভাবতে চাই—

রঞ্জন: যে আজ্ঞে—

রঞ্জন ফিরিয়া গিয়া নিজের গাড়ীর উপর বসিল।

কেদার: কাল তুমি এসো--বুঝলে?

রঞ্জন: আজ্ঞে—আচ্ছা—নমস্কার—

রঞ্জনের গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যে দিকে মঞ্জুর গাড়ী গিয়াছিল সেইদিকে চলিল।

ডিজল্ভ্।

পার্ব্বত্য ভূমি। রঞ্জনের মোটর বাইক ধীরে ধীরে চলিয়াছে রঞ্জন সচকিতভাবে আশপাশের ঝোপঝাপের দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে।

যে স্থানে তাহাদের গাড়ী দাঁড়াইত সেখানে আসিয়া দেখিল

মঞ্জুর গাড়ী নাই। তারপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, অদূরে একটি গাছের নীচু ডাল হইতে দুটি জুতাপরা পদপল্লব দুলিতেছে। গাছের পাতায় চরণ দুটির স্বত্বাধিকারিণীর উর্দ্ধাঙ্গ দেখা যাইতেছে না।

রঞ্জন পা দুটি মঞ্জুর মনে করিয়া দ্রুত গাছের তলায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মুখের সাগ্রহ ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া বিরক্তির আকার ধারণ করিল। বৃক্ষারূঢ়া তরুণী সাবলীল ভঙ্গীতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া কলহাস্য করিল।

ক্ষুব্ধ হতাশ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন : সলিলা দেবী! আপনিও এসে পৌছে গেছেন! (দীর্ঘশ্বাস)—আচ্ছা, নমস্কার!

রঞ্জন পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্প দূর গিয়াই পিছু ডাক শুনিয়া তাহাকে থামিতে হইল।

সলিলা : শুনুন—রঞ্জনবাবু!

সলিলা রঞ্জনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সলিলা : এত দিন পরে দেখা, আর কোনও কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন! উঃ, আপনি কি নিষ্ঠুর!

রঞ্জন : নিষ্ঠুর! দেখুন—মাফ করবেন। আজ আমার মনটা ভাল নেই।

সে আবার গমনোদ্যত হইল। এমন সময় পিছন হইতে মীরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মীরা : মন ভাল নেই! কী হয়েছে রঞ্জনবাবু?

দৈবী আবির্ভাবের মত মীরা দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা মিশাইয়া বলিলেন—

মীরা: শরীর ভাল নেই বুঝি?

রঞ্জন: (দৃঢ়স্বরে) না, শরীর বেশ ভাল আছে—মন খারাপ।

এইবার মলিনা দেবীর মধুর স্বর শোনা গেল; ভোজবাজীর মত আবির্ভূতা হইয়া তিনিও এইদিকেই আসিতেছেন।

মলিনা: কেন মন খারাপ হল রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল; মলিনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে বলিল—

রঞ্জন: আপনার পা তো বেশ সেরে গেছে দেখছি—

মলিনা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যে বলিল—

মলিনা: তা সারবে না? আপনি কত যত্ন ক'রে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন—জানিস ভাই, সেদিন কি হয়েছিল—

ইন্দুর ক্লান্ত কণ্ঠ শোনা গেল।

ইন্দু: জানি—আমরা অনেকবার শুনেছি।

তরুণীত্রয় চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল ইন্দু কখন তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রঞ্জন আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বোধ করি ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিল।

ইন্দু সহজ ভাবে বলিল—

ইন্দু : সবাই দাঁড়িয়ে কেন? আসুন রঞ্জনবাবু, ঘাসের ওপর বসা যাক—

রঞ্জন : বেশ, যা বলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতী-চতুষ্টয় প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পর তাকাতেই লাগিলেন।

রঞ্জন : এবার কি করতে চান?

মীরা : এবার? তাই তো?

সকলেই চিন্তিত। মলিনা উজ্জ্বল চোখ তুলিয়া চাহিল।

মলিনা : আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।—আসুন পাঁচজনে মিলে লুকোচুরি খেলা যাক—

ইন্দু : (ঠোঁট উল্টাইয়া) লুকোচুরি।

রঞ্জন : লুকোচুরি—

হঠাৎ তাহার মাথায় কূটবুদ্ধি খেলিয়া গেল। মেয়েরা তাহার মতামত অনুধাবন করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল—

রঞ্জন : তা মন্দ কি! আসুন না খেলা যাক। এখানে লুকোবার জায়গার অভাব নেই।

রঞ্জনের মত আছে দেখিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মলিনার উত্তেজনা সবচেয়ে বেশী।

মলিনা : বেশ। প্রথমে কে চোর হবে?

রঞ্জন : আমি আঙুল মটকাচ্ছি।

রঞ্জন পিছনে হাত লুকাইয়া আঙুল মটকাইল; তারপর

তরুণীদের সম্মুখে হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল। তরুণীগণ নানাপ্রকার আশঙ্কার অভিনয় করিতে করিতে গলার মধ্যে চাপা হাসি হাসিতে হাসিতে এক একটি আঙুল ধরিলেন।

রঞ্জন বিষণ্ণ স্বরে বলিল—

রঞ্জন : আমিই চোর হলাম। বুড়ো আঙুল মটুকে ছিল।

তরুণীগণ সকলেই খুশী হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মীরা : বেশ। আপনি তাহ'লে চোখ বুজে বসুন। কিন্তু বুড়ী হবে কে?

রঞ্জন চট্‌ করিয়া বলিল—

রঞ্জন : ঐ যে আমার গাড়ীটা বুড়ী।

মীরা : আচ্ছা—

চারিটি যুবতী চারিদিকে চলিলেন। রঞ্জন দু'হাতে চোখ ঢাকিল।

মলিনা : (যাইতে যাইতে) টু না দিলে চোখ খুলবেন না যেন।

রঞ্জন মাথা নাড়িল। তরুণীগণ পা টিপিয়া টিপিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারিদিক হইতে টু শব্দ আসিল। রঞ্জন চোখ হইতে হাত সরাইয়া সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর হঠাৎ তীরবেগে নিজের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুট দিল।

তরুণীগণ কিছুই জানিলেন না। রঞ্জন মোটরবাইক ঠেলিতে

ঠেলিতে তাহাতে স্টার্ট দিয়া লাফাইয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ফট্‌ফট্‌ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তরুণীগণ বাহির হইয়া আসিল। স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দিগ্বিদিকৃজ্ঞানশূন্যভাবে পলাইতে পলাইতে রঞ্জন পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া হঠাৎ সবলে ব্রেক কশিল। প্রায় একশত গজ দূরে অসমতল ভূমির উপর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঞ্জু ও মিহির বিপরীত মুখে চলিয়াছে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া রঞ্জন পদব্রজে তাহাদের অনুসরণ করিল।

মঞ্জু ও মিহির পাশাপাশি চলিয়াছে, পিছন দিক হইতে রঞ্জন যে দীর্ঘ পদক্ষেপে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। কাছাকাছি পৌছিয়া রঞ্জন গলা চড়াইয়া ডাকিল—

রঞ্জন : মঞ্জু!

মঞ্জু ও মিহির থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুর মুখ অপ্রসন্ন। রঞ্জন কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে হঠাৎ পিছু ফিরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক পা গিয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—

মঞ্জু : আসুন মিহিরবাবু!

মিহির ইতস্তত করিতেছিল, আহ্বান শুনিয়া যেই পা বাড়াইয়াছে অমনি রঞ্জনের হস্ত কাঁধের উপর পড়িয়া তাহার গতিরোধ করিল। মিহির ভ্যাবাচাকা খাইয়া রঞ্জনের মুখের

পানে তাকাইল। রঞ্জন গম্ভীরমুখে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—

রঞ্জন : আপনি ঐদিকে যান—

বলিয়া বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

মিহির : ঐদিকে?

রঞ্জন : হ্যাঁ, ঐদিকে।

কাঁধের কামিজ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রঞ্জন মিহিরকে একটি অনুচ্চ ঢিবির উপর লইয়া গেল; দূরে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল—

রঞ্জন : দেখ্ছেন?

মিহির দেখিল—দূরে চারিটি তরুণী একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে যে পথে রঞ্জন পলাইয়াছিল সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। মিহিরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে একবার রঞ্জনের দিকে সহাস্যমুখে ঘাড় নাড়িয়া দ্রুতপদে ঢিবি হইতে নামিয়া তরুণীদের অভিমুখে চলিল।

এইরূপে মিহিরকে বিদায় করিয়া রঞ্জন আবার মঞ্জুর পশ্চাদ্ধাবন করিল।

মঞ্জু ইতিমধ্যে খানিকদূর গিয়াছে। পিছন হইতে তাহার চলনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় সে অত্যন্ত রাগিয়াছে। সে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, রঞ্জন আসিতেছে—মিহির পলাতক। সে সক্রোধে আরও জোরে চলিতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে রঞ্জনের গলা আসিল—

রঞ্জন : মঞ্জু! দাঁড়াও!

মঞ্জু দাঁড়াইল না, একটা উঁচু চ্যাঙড়ের পাশ দিয়া মোড় ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনও সেইখানে মোড ফিরিয়া মঞ্জুর অনুসরণ করিল।

ক্রমে মঞ্জু নদীর বালুর উপর গিয়া পড়িল। অদূরে ছোট নদীর বুকের উপর মাঝে মাঝে পাথরের চাপ বসাইয়া পারাপারের সেতু রহিয়াছে; ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মঞ্জু সেই সেতু লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

পিছন হইতে রঞ্জন ডাকিল—

রঞ্জন: মঞ্জু! শোনো—

কিন্তু শুনিবে কে? মঞ্জু তখন নদীর কিনারায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। সে সেতুর প্রথম ধাপের উপর লাফাইয়া উঠিয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল—রঞ্জন অনেকটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সে আর দ্বিধা না করিয়া দ্বিতীয় পাথরের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার মনের অবস্থা এমন যে রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে নদী পার হইয়া যেখানে খুশী চলিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

নদীর ঠিক মাঝখানে যে পাথরটি বসানো আছে তাহা সবচেয়ে বড! সেটার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মঞ্জু চকিতের ন্যায় পিছু ফিরিয়া দেখিল রঞ্জন নদীর কিনারায় প্রথম ধাপের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

রঞ্জন উৎকন্ঠিত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল—

রঞ্জন: মঞ্জু, আর যেও না—জলে পড়ে যাবে—

মঞ্জু তখন বাকি পাথরগুলি লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া রঞ্জনের মুখে হঠাৎ একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল। সেও নদী লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইল।

ওদিকে মঞ্জু তখন প্রায় পরপারে পৌছিয়াছে। শেষ ধাপে পৌছিতেই পিছন হইতে একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার তাহার কাণে আসিল; সে চমকিয়া পিছু ফিরিয়া ক্ষণকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিল।

নদীর মাঝখানে পাথরটার ঠিক পাশে রঞ্জন জলে পড়িয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতেছে; তাহার অসহায় হাত পা আস্ফালন দেখিয়া মনে হয় সে ডুবিল বলিয়া, আর দেরী নাই।

মঞ্জু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পাথরের কিনারায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে রঞ্জনের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—

মঞ্জু: এই যে—রঞ্জনবাবু, আমার হাত ধরুন!

রঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে মঞ্জুর প্রসারিত হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। মঞ্জু প্রাণপণে টানিয়া তাহাকে পাথরের কিনারায় লইয়া আসিল।

এখানেও গলা পর্য্যন্ত জল। মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু: এবার উঠে আসুন—

রঞ্জন মুখের জল কুলকুচা করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—

রঞ্জন: আগে বল আমার কথা শুনবে।

মঞ্জুর মুখ অমনি শক্ত হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অপ্রসন্ন হইল। রঞ্জন তাহা দেখিয়া বলিল—

রঞ্জন : শুনবে না ? বেশ—তবে—

মঞ্জুর হাত ছাড়িয়া দিয়া সে আবার ডুবিবার উপক্রম করিল। তাহার মাথা জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গেল ; একটা হাত যেন শূন্যে কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া মস্তকের অনুবর্ত্তী হইল। ভয় পাইয়া মঞ্জু চীৎকার করিয়া উঠিল—

মঞ্জু : ও রঞ্জনবাবু!

রঞ্জনের মাথা আবার জাগিয়া উঠিল।

রঞ্জন : বল কথা শুনবে ? শুনবে না ? তবে—

রঞ্জন আবার ডুবিতে উদ্যত হইল।

মঞ্জু : শুনবো শুনবো—আপনি আগে উঠে আসুন।

মঞ্জু হাত বাড়াইয়া দিল ; রঞ্জন হাত ধরিয়া পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

গত কয়েক মিনিটের ব্যাপারে মঞ্জুর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল ; সে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। রঞ্জনও সিক্ত বস্ত্রাদি সমেত তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—

রঞ্জন : উঃ! কী গভীর জল

শঙ্কিতমুখে মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু : কত জল ?

রঞ্জনের অধর কোণে একটি ক্ষণিক হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল ; সে গম্ভীর মুখে যেন হিসাব করিতে করিতে বলিল—

রঞ্জন : তা—প্রায়—আমার কোমর পর্য্যন্ত হবে!

মঞ্জুর অধরোষ্ঠ খুলিয়া গেল; সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া পুরুষ জাতির হীন প্রবঞ্চনায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সে রঞ্জনের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বসিল।

রঞ্জন: পিছু ফিরলে চলবে না; কথা দিয়েছ, আমার কথা শুনতে হবে।

দুর্লঙ্ঘ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু: কি বলবেন বলুন—আমি শুনতে পাচ্ছি।

রঞ্জন তখন উঠিয়া মঞ্জুর পিছনে নতজানু হইয়া বসিল; গলা পরিষ্কার করিয়া যোড় হস্তে বলিল—

রঞ্জন: আপনার কাছে অধমের একটি আর্জ্জি আছে—

মঞ্জু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; রঞ্জনের হাস্যকর ভঙ্গিমা দেখিয়া হাসি পাইলেও সে মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। রঞ্জন দীনতা সহকারে বলিল—

রঞ্জন: আমার বিনীত আর্জ্জি এই যে, আমি বড় বিপদে পড়েছি, আপনি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন—

মঞ্জু নিরুৎসুক স্বরে বলিল—

মঞ্জু: কি বিপদ?

মর্ম্মান্তিক মুখ-ভঙ্গী করিয়া রঞ্জন আকাশের পানে তাকাইল।

রঞ্জন: কি বিপদ! এমন বিপদ আজ পর্য্যন্ত মানুষের হয় নি। —একটি নয় দুটি নয়, চার চারটি তরুণী আমাকে তাড়া ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে—আনাচে কানাচে ওৎ পেতে বসে আছে,

সুবিধে পেলেই আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।—মেঘনাদ বধ পড়েছ তো—

—রক্তচক্ষু হর্য্যক্ষ যেমতি
কড়মড়ি ভীম দন্ত পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে—

শুনিতে শুনিতে মঞ্জুর মুখের মেঘ একেবারে কাটিয়া গিয়াছিল; অধরপ্রান্তে হাসি উছলিয়া উঠিতেছিল। তবু সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল—

মঞ্জু: এই বিপদ!

রঞ্জন: এটা সামান্য বিপদ হ'ল! রাত্রে দুশ্চিন্তায় আমার চোখে ঘুম নেই; দিনের বেলা বাড়ীতে থাকতে ভয় করে—এখানে পালিয়ে আসি। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? আজ তো চারজনে একসঙ্গে ধরেছিল—

মঞ্জু আর বুঝি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। চাপা বিকৃত স্বরে সে বলিল—

মঞ্জু: তা আমি কি করব?

রঞ্জন এবার তাহার ভক্ত-হনূমানভঙ্গী ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল, সহজ মিনতির স্বরে বলিল—

রঞ্জন: মঞ্জু, কেউ যদি আমাকে উদ্ধার করতে পারে তো সে তুমি। সত্যি বলছি, তুমি যদি কিছু না কর, ওরা কেউ না কেউ জোর করে আমাকে বিয়ে করে ছাড়বে!

মঞ্জু: তা বেশ তো—ভালই তো হবে।

ভৎর্সনাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রঞ্জন মঞ্জুর কাঁধ ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল, মঞ্জু পূরা ফিরিল না, আধাআধি ফিরিল।

রঞ্জন : মঞ্জু, তুমি এ কথা বল্‌তে পারলে ? মন থেকে ?

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল।

মঞ্জু : তা আর কি বলব ? আমি কি করতে পারি ?

রঞ্জন : তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো।

মঞ্জু গ্রীবা বাঁকাইয়া হাসিল।

মঞ্জু : কি ক'রে বাঁচাব ?

রঞ্জন মঞ্জুর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—

রঞ্জন : বুঝতে তো পেরেছ, তবে কেন দুষ্টুমি করছ ? সত্যি মঞ্জু, বল আমাকে বিয়ে করবে !

মঞ্জু হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

মঞ্জু : হাত ছেড়ে দাও।

রঞ্জন : ছাড়ব না। আগে বল বিয়ে করবে।

মঞ্জু ঘাড় নীচু করিয়া রহিল ; মুখ টিপিয়া বলিল—

মঞ্জু : কেন ? ওদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ?

রঞ্জন : শুধু তাই নয়।

রঞ্জন তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া আনিল।

রঞ্জন : মঞ্জু, এখনও মনের কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে ? বেশ বল্‌ছি—আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি। এবার বল, বিয়ে করবে ?

মঞ্জুর নত মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিয়াছিল; সে উত্তর না দিয়া পাথরের উপর আঁচড় কাটিতে লাগিল।

রঞ্জন : বল। না বললে ছাড়বো না।

মঞ্জু এবার চোখ ছুটি একটু তুলিল।

মঞ্জু : তুমি কি সায়েব ?

রঞ্জন কথাটা বুঝিতে পারিল না।

রঞ্জন : সায়েব ? তার মানে ?

মঞ্জু : বাবাকে বলতে হবে না ?

রঞ্জন : (বুঝিতে পারিয়া) ওঃ—! না, সায়েব নই। তাঁকেও বলব, আমার বাবাকেও বলব। কিন্তু তার আগে তোমার মনের কথাটা তুমি বল মঞ্জু—

মঞ্জু : সব কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে হবে ?

রঞ্জন : হ্যাঁ।

মঞ্জু হাসিয়া পাশের দিকে চোখ ফিরাইল, তারপর ঘাড় তুলিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

রঞ্জন : কই, বললে না ?

মঞ্জু অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল—

মঞ্জু : ঐ গ্যাখো—

রঞ্জন চোখ তুলিয়া দেখিল, কিছু দূরে নদীর কিনারায় এক সারস-দম্পতি আসিয়া বসিয়াছে। তাহারা পরস্পর চঞ্চু চুম্বন করিতেছে, গলায় গলা জড়াইয়া আদর করিতেছে।

তুজনে পাশাপাশি বসিয়া পক্ষী-দম্পতির অনুরাগ-নিবেদন

দেখিতে লাগিল। তারপর রঞ্জন মঞ্জুর কাছে আরও ঘেঁসিয়া বসিয়া এক হাত দিয়া তার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া লইল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

অপরাহ্ণ। ঝাঝায় রঞ্জনের বাড়ীতে একটি ঘর। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া রঞ্জন বেশভূষা করিতেছে ও মৃদুকণ্ঠে সুর ভাঁজিতেছে। পাঞ্জাবীর গলার বোতামটা খোলা রাখিয়া দিয়া চুলে বুরুশ ঘষিতে ঘষিতে রঞ্জন আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইল—ভৃত্য রমাই একটি পোস্টকার্ড হাতে লইয়া প্রবেশ করিতেছে।

রমাই মধ্যবয়স্ক কৃশ ও বেঁটে, পুরুলিয়া অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। রঞ্জন আয়নার ভিতরে রমাইয়ের প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন : কি রে রমাই ?

রমাই : একটি পোস্টকাট্ আইছেন আজ্ঞে।

রঞ্জন পোস্টকার্ড হাতে লইয়া বলিল—

রঞ্জন : বাবা লিখেছেন—

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

রঞ্জন : বাবা আসছেন। রমাই—বাবা আসছেন ! ভালই হ'ল—

রমাই : কবে আসতেছেন কুর্ত্তাবাবু আজ্ঞে ?

রঞ্জন : অ্যাঁ—কবে ? (চিঠির উপর আবার চোখ বুলাইয়া)

কই তা তো কিছু লেখেন নি। আজ-কালের মধ্যেই আসবেন নিশ্চয়। ভালই হ'ল—আমাকে আর কলকাতা যেতে হ'ল না—(রমাইয়ের পিঠে সস্নেহে একটি চাঁটি মারিয়া) কি চমৎকার যোগাযোগ দেখেছিস রমাই? বাবাও ঠিক এই সময় এসে পড়েছেন—

রমাই : যোগাযোগটা কিসের আজ্ঞে ?

রঞ্জন বিস্মিতভাবে তাহার পানে তাকাইল, তারপর হাসিয়া উঠিল।

রঞ্জন : ও—তুই বুঝি জানিস না। শিগ্‌গির জানতে পারবি। এখন যা, বাবার ঘর ঠিক ক'রে রাখ গে—

রঞ্জন চেয়ারের পিঠ হইতে একটা কোঁচানো চাদর তুলিয়া গায়ে জড়াইতে লাগিল।

রমাই : আজ কি বাড়ীতে চা খাওয়া হবেন না আজ্ঞে ?

রঞ্জন : না আজ্ঞে, আজ অন্য কোথায় চা খাওয়া হবেন আজ্ঞে।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে রঞ্জন বাহির হইয়া গেল। রমাই তাহার প্রবীণ বহুদর্শী চক্ষুদুটি একটু কুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। সম্মুখের বন্ধ দরজা ভেদ করিয়া সঙ্গীতের চাপা আওয়াজ আসিতেছে।

কেদারবাবু ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া

দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলেন ; অমনি সঙ্গীতের পূর্ণ আওয়াজ মেঘভাঙা রৌদ্রের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

কেদারবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কাট্।

মঞ্জু পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুলে বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে ; তাহার মন যেন কোন্ স্বপ্নলোকে ভাসিয়া গিয়াছে ; অন্তরের মাধুর্য্য-রসে আবিষ্ট চোখদুটি ফিরিয়া ফিরিয়া দেয়ালে টাঙানো রঞ্জনের ছবিটিকে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যাইতেছে।

মঞ্জু গাহিতেছে—

"দখিন হাওয়া—
আমার বুকের মাঝে পরশ দিয়ে যায়।
—দখিন হাওয়া।
কার নয়ন দুটি মরম বিঁধে চায়—
—দখিন হাওয়া।
আমি মন হারালাম নদীর কিনারায়—
—দখিন হাওয়া।"

গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই কেদারবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং নিঃশব্দে একটি সোফায় গিয়া বসিয়াছিলেন। মঞ্জু জানিতে পারে নাই। গান শেষ করিয়া মঞ্জু যখন ফিরিয়া বসিল তখন সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল ; সলজ্জ ধরা-পড়িয়া-যাওয়া ভাব। তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল—

মঞ্জু : বাবা, ডাক্তারের বাড়ী থেকে কখন ফিরলে ?

কেদার : এই খানিকক্ষণ। গান শেষ হয়ে গেল ?

মঞ্জু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া কেদারের পাশে আসিয়া বসিল।

মঞ্জু : জাপানী গান কি না, তাই তিন লাইনে শেষ হয়ে গেল।—ডাক্তার কি বললেন ?

কেদার বিরক্তি ও বিদ্বেষপূর্ণ মুখভঙ্গী করিলেন।

কেদার : কী আর বলবে! যত সব গো-বদ্যি। রোগ আরাম করতে পারে না, বলে 'দাঁত তুলিয়ে ফেলুন' হুঁ! কিন্তু মরুক গে ডাক্তার। তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

কেদার যেরূপ গম্ভীরকণ্ঠে কথাটা বলিলেন তাহাতে চকিত আশঙ্কায় মঞ্জু তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিল।

মঞ্জু : কি কথা বাবা ?

কেদার পিঠ ঠেসান দিয়া বসিলেন, ফাঁসির হুকুম-জারি করার মত কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—

কেদার : আমি তোমার বিয়ে ঠিক করেছি—

মঞ্জুর মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু উৎকণ্ঠা কমিল না। কেদার হাকিমীকণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—

কেদার : আমি তোমাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছি—সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে চাইবে আশা করি এতটা স্বাধীন এখনও হও নি।

মঞ্জুর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল; চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল। ঢোক গিলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু : না বাবা।

কেদার সন্তুষ্ট হইয়া গলার মধ্যে একটি হুঙ্কার করিলেন। তাহার স্বর একটু নরম হইল।

কেদার : বেশ। এখন আমার কাছে সরে আয়।

পূর্ব্বগামী কথোপকথনের মধ্যে মঞ্জু নিজের অজ্ঞাতসারে কেদার হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়াছিল ; এখন আবার তাঁহার পাশে ঘেঁষিয়া বসিল। কেদার সহসা হস্ত প্রসারিত করিয়া বঞ্জনের ছবির দিকে নির্দ্দেশ করিলেন—

কেদার : এবার ছাখ, ঐ ছেলেটিকে পছন্দ হয় ?

কেদার মঞ্জুর পানে চোখ ফিরাইলেন। মঞ্জু চকিত কটাক্ষে ছবিটা দেখিয়া লইয়া ঘাড় নীচু করিয়া ফেলিয়াছিল ; অস্পষ্ট লজ্জা-রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু : আমি জানি না।

কেদার কিন্তু এরূপ অ-সন্তোষজনক কথায় তৃপ্ত হইবার পাত্র নয় ; তিনি মঞ্জুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেদার : আমার ওকে খুব পছন্দ হয়। তুই কি বলিস ?

মঞ্জু : (নতচক্ষে)—তুমি যা বলবে তাই হবে।

বসিয়া লজ্জারুণ মুখখানা কেদারবাবুর বগলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। কেদারের মুখে এতক্ষণে সত্যসত্যই প্রসন্নতা জাগিয়া উঠিল ; হয় তো তাঁহার অধরোষ্ঠের কোণ উর্দ্ধমুখী হইয়া একটু হাসির আভাসই প্রকাশ করিল।

কেদার : বেশ—আমার মেয়ের মুখ থেকে আমি এই কথাই শুনতে চাই—(রঞ্জনের ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) ছোকরা সব দিক দিয়েই সুপাত্র। সায়েন্স্ পড়েছে—দেখতে শুনতেও ভাল—এখন কেবল ওর বংশ পরিচয় পেলেই—

বহির্দ্বারের কাছে গলা ঝাড়াব শব্দ শুনিয়া কেদার সেইদিকে ফিরিয়া দেখিলেন—রঞ্জন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছে ; পিতাপুত্রীর ঘনিষ্ঠ ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে।

কেদার : (প্রশান্তকণ্ঠে) এসো রঞ্জন, তোমার অপেক্ষা করছি—

মঞ্জু পিতার কুক্ষি হইতে মুখ তুলিয়া রঞ্জনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেদারবাবু যতক্ষণে রঞ্জনকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইতেছিলেন মঞ্জু ততক্ষণে অলক্ষিতে ভিতরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তাহার ঘর ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা সফল হইল না। কেদারবাবু ডাকিলেন—

কেদার : মঞ্জু, তুই যাস নি—আমাদের কথা এমন কিছু গোপনীয় নয়—

দ্বারের কাছেই পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুল ছিল, মঞ্জু সঙ্কুচিতভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

রঞ্জন ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছিল ; কেদারবাবু তাহাকে সোজাসুজি বলিলেন—

কেদার : তোমাকে ডেকেছিলুম। মঞ্জুর এবার বিয়ে দেওয়া

দরকার। আমার দাঁতের রোগ, কোন্ দিন আছি কোন্ দিন নেই—

রঞ্জন : আজ্ঞে সে কি কথা।

কেদার : না না, তোমরা ছেলেমানুষ বোঝ না—দাঁত বড় ভয়ঙ্কর জিনিস ; কিন্তু সে যাক, তুমি কায়স্থ তো ?

রঞ্জন : আজ্ঞে হ্যাঁ—উত্তর রাঢী।

কেদার : বেশ বেশ।

ওদিকে মঞ্জু চুপটি করিয়া বসিয়া শুনিতেছে ; সে একবার চোখ তুলিয়া আবার নামাইয়া ফেলিল। কেদার বলিতে লাগিলেন—

কেদার : এতদিন তুমি যাওয়া-আসা করছ অথচ তোমার কোনও পরিচয়ই নেওয়া হয় নি। তোমার বাবার নামটি কি বল তো।

রঞ্জন : আজ্ঞে আমার বাবার নাম শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

কেদারবাবু হাসিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন ; তারপর ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় চক্রাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া উঠিল।

কেদার : প্র—! কি বললে তোমার বাপের নাম ?

রঞ্জন : আজ্ঞে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

কেদার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জনও হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়াইল। কেদারের কণ্ঠে একটি অন্তর্গূঢ় মেঘগর্জ্জন হইল।

কেদার : প্রতাপ সিংগি! তুমি—প্রতাপ সিংগির ব্যাটা—অ্যাঁ!

রঞ্জন : আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু—

কেদারবাবু রক্তনেত্রে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

কেদার : তোমার বাপের গালে এতবড় আব্ আছে ?

বলিয়া হাতে কমলালেবুর মত আকার দেখাইলেন। রঞ্জন বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিল—

রঞ্জন : আজ্ঞে না, অতবড় নয়—এতটুকু—

বলিয়া সুপারির আকার দেখাইল। কেদার সহসা সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

কেদার : ব্যস্—আর সন্দেহ নেই। তুমি সেই দুশমনের বাচ্ছা !

মঞ্জু কাঠ হইয়া বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল ; রঞ্জন বিভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল ; কেদার তাহার মুখের সামনে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কেদার : তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয় ছোকরা ! প্রতাপ সিংগির ব্যাটা হয়ে তুমি আমার বাড়ীতে ঢুকেছ ? বেল্লিক বেয়াদপ !

হঠাৎ টেবিল হইতে একটি ফুলদানি তুলিয়া লইয়া তিনি দু'হাতে সেটা মাটিতে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন। মঞ্জু চীৎকার করিয়া উঠিল।

মঞ্জু : বাবা !

আহত সিংহের মত কেদার কন্যার দিকে ফিরিলেন।

কেদার : খবরদার ! যদি আমার মেয়ে হোস্, একটি কথা কইবি না—

মঞ্জু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধর দংশন করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। কেদার রঞ্জনের দিকে ফিরিলেন ; ডান হাতের মুষ্টি তাহার নাকের কাছে ধরিয়া এবং বাঁ হাতের তর্জ্জনী বহির্দ্বারের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি চীৎকার ছাড়িলেন—

কেদার : ঐ দরজা দেখতে পাচ্ছ ? সোজা বেরিয়ে যাও। আর যদি কখনও আমার বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ—মাথা ফাটিয়ে দেব। যা—ওঁ !

রঞ্জন মোহাচ্ছন্নের মত কেদারবাবুর মুষ্টির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন মাথা ঝাড়া দিয়া নিজেকে কতকটা সচেতন করিয়া লইল, তারপর তন্দ্রাহতের মত বলিল—

রঞ্জন : আচ্ছা—আমি যাচ্ছি।

সে দ্বারের দিকে ফিরিল।

মঞ্জু মিউজিক টুলে বসিয়াছিল ; তাহার নিপীড়িত চক্ষু দুটি এতক্ষণ ব্যাকুলভাবে এই দৃশ্যের মর্ম্মানুসন্ধান করিতেছিল ; রঞ্জন দ্বারের অভিমুখী হইতেই সে পিয়ানোর উপর হাত রাখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিয়ানো আর্ত্ত বেসুরাকণ্ঠে আপত্তি জানাইল।

কেদার চীৎকার করিয়া চলিলেন—

কেদার : যত সব ঠগ্ জোচ্চোর দাগাবাজ ! প্রতাপ সিংগির ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে ?

রঞ্জন দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, একবার দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। অমনি কেদারবাবুর বজ্রনাদ আসিল—

কেদার: বেরোও

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

মঞ্জু সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন পিতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল তিনি আর কিছু না পাইয়া গট্‌গট্‌ করিয়া দেয়ালে লম্বিত রঞ্জনের ছবিটার পানে চলিয়াছেন। মঞ্জু অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মঞ্জু: বাবা!

ছবির নিকটে পৌছিয়া কেদার কট্‌মট্‌ করিয়া একবার মঞ্জুর পানে তাকাইলেন, তারপর দু'হাতে হেঁচ্‌কা মারিয়া ছবিটাকে দেয়াল হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর ঝড়ের শক্তি ফুরাইয়া গেলে প্রকৃতি যেমন ক্লান্ত নিঝুম হইয়া পড়ে, কেদারবাবুর ক্রুদ্ধ আস্ফালনও তেমনি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিল; তিনি অবসন্ন দেহে ফিরিয়া গিয়া একটা কৌচে বসিয়া পড়িলেন। গালে হাত দিয়া একবার অনুভব করিলেন। যেন দন্তশূলের পূর্ব্বাভাস পাইতেছেন।

মঞ্জু পিয়ানোর পাশে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ফ্যাকাসে রক্তহীন মুখে ঠোঁটদুটি অল্প কাঁপিতেছিল। কেদার তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ঈষৎ ভাঙা গলায় ডাকিলেন—

কেদার: মঞ্জু, এদিকে এস।

মঞ্জু একবার চোখ তুলিল ; তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেদার পাশে হাত রাখিয়া বলিলেন—

কেদার : বোসো।

যন্ত্রের পুতুলের মত মঞ্জু নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল। কেদার একবার গলা-খাঁকারি দিলেন, যে জোর মনের মধ্যে নাই তাহাই যেন কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিলেন ; তারপর অন্যদিকে তাকাইয়া বলিলেন—

কেদার : ও আমার শত্তুরের ছেলে ; ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

মঞ্জু প্রথমটা উত্তর দিল না, তারপর মনের ব্যাকুলতা যথাসম্ভব দমন করিয়া বলিল—

মঞ্জু : ওঁকে কেন অপমান করলে বাবা ? উনি তো কিছু করেন নি।

কেদারবাবুর মুখ একগুঁয়ে ভাব ধারণ করিল।

কেদার : না করুক—ওর বাপ আমার শত্তুর !

মঞ্জু : কিন্তু—কি নিয়ে এত শক্রতা ?

কেদার স্মৃতির ফুটন্ত জলে অবগাহন করিলেন, কিন্তু অনুভূতিটা আরামদায়ক হইল না। ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তাহা অনেক সময় এমন লঘু প্রতীয়মান হয় যে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কেদার প্রশ্নটা এড়াইয়া গেলেন।

কেদার : তা এখন আমার মনে পড়ছে না—পঁচিশ বছরের

কথা। কিন্তু সে যাই হোক্, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। বুঝলে ?

মঞ্জু হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। কেদার কন্যার মনের ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না ; আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাঁহার মুখের আকৃতি হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিল। তিনি চাপা আবেগের স্বরে বলিলেন—

কেদার ঃ মঞ্জু, আমার আর কেউ নেই, ছেলে বলতে মেয়ে বলতে সব তুই। তোর বুড়ো বাপের মনে যাতে আঘাত লাগে এমন কাজ তুই বোধ হয় করবি না—

মঞ্জু আর পারিল না, কেদাববাবুর উরুর উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল ; তারপর বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ না বাবা, সে ভয় তুমি কোরো না—

ডিজল্‌ভ্‌।

বাড়ীর পাশে জানালা হইতে কিছু দূরে রঞ্জনের ফটোখানা ভাঙা অবস্থায় পড়িয়া আছে। জাপানী ফ্রেম কেদারবাবুর প্রচণ্ড দাপট সহ্য করিতে পারে নাই।

মঞ্জু পাশের একটা দরজা দিয়া সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছবিটি তুলিয়া ভাঙা ফ্রেম হইতে উদ্ধার করিল, তারপর বুকের মধ্যে লুকাইয়া যেমন সন্তর্পণে আসিয়াছিল তেমনি বাড়ীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কাট্‌।

ঝাঝায় রঞ্জনের বাড়ীর সম্মুখস্থ খোলা বারান্দা। বাড়ীটি রাস্তা হইতে খানিকটা পিছনে অবস্থিত; ফটক পার হইয়া বড় বড় ঝাউয়ের শাস্ত্রী-রক্ষিত কাঁকরের সড়ক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরিয়া বাড়ীর সম্মুখে পৌছিয়াছে। ফটক হইতে বারান্দা দেখা যায় না।

বারান্দার উপর টেবিল চেয়ার পাতা হইয়াছে; টেবিলের উপর চায়ের সরঁঞ্জাম, টোস্ট্ মাখন কেক্ ইত্যাদি। একটি চেয়ারে বসিয়া প্রতাপবাবু টোস্টে মাখন মাখাইয়া তাহাতে কামড় দিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইতেছেন। ভৃত্য রমাই আশেপাশে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বারান্দার নীচে জুতার মশ্‌মশ্‌ শব্দ শুনা গেল; প্রতাপ পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রঞ্জন বিষণ্ণ অন্যমনস্কভাবে আসিতেছেন, পিতাকে বারান্দার উপর আসীন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মন এত শীঘ্র পিতৃদর্শনের জন্য প্রস্তুত ছিল না; সে কতকটা বিস্ময়ভাবেই বলিয়া উঠিল—

রঞ্জন: বাবা!

তারপর আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক মুখে হাসি আনিয়া সে তাড়াতাড়ি বারান্দার উপর উঠিয়া গেল।

প্রতাপও কামিজের হাতায় মুখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; রঞ্জন আসিয়া প্রণাম করিতেই তাহাকে সস্নেহে

আলিঙ্গন করিলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধটা ছিল প্রায় সমবয়স্ক বন্ধুর মত।

প্রতাপ: কেমন আছিস?

রঞ্জন: (মুখ প্রফুল্ল করিয়া) ভাল আছি বাবা। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে!

প্রতাপ: এম্‌নি—অনেক দিন তুই কাছছাড়া—ভাবলুম একবার দেখে আসি।

প্রতাপ স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া বসিলেন, রঞ্জন তাঁহার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিল। পিতার কথায় সে একটু কোমল হাসিল।

রঞ্জন: ও। ভালই তো, তবু দুদিন বিশ্রাম করতে পারবে। —রমাই, আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়—

রমাই প্রস্থান করিল। রঞ্জনের পক্ষে প্রফুল্লতার মাত্রা বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, প্রদীপে যখন তৈলের অভাব তখন কেবল মাত্র সল্‌তে উস্কাইয়া তাহাকে কতক্ষণ বাঁচাইয়া রাখা যায়! প্রতাপ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিতে তুলিতে তীক্ষ্ণচক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

রমাই পেয়ালা লইয়া ফিরিল, রঞ্জনের সম্মুখে রাখিতে রাখিতে বলিল—

রমাই: বাইরে চা খাওয়া হলেন না আজ্ঞে?

রঞ্জন সচকিতে চোখ তুলিল; তাহার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঘাড় হেঁট করিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—

রঞ্জন : না।

প্রতাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। রঞ্জন একচুমুক চা খাইয়া বাঁ হাত গালে দিয়া বসিল। প্রতাপ টোস্টের পাত্রটা তাহার দিকে ঠেলিয়া দিলেন, রঞ্জন মাথা নাড়িয়া সেটা তাঁহার দিকে ফেরত দিল। তখন প্রতাপ আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি হয়েছে রঞ্জন ?

রঞ্জন সোজা হইয়া বসিয়া মুখে হাসি আনিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জন : কই—কিছুই তো হয় নি !

প্রতাপ : তবে গালে হাত দিয়ে অমন ক'রে বসে আছিস কেন ?—(সহসা) হাঁরে, দাঁতের ব্যথা নয় তো ?

বলিতে বলিতে তিনি নিজের পকেটে হাত পুরিলেন।

রঞ্জন হাসিয়া ফেলিল।

রঞ্জন : না বাবা, দাঁত ঠিক আছে।

প্রতাপ : তবে ? অমন ক'রে বসে আছিস, কিছু খাচ্ছিস না—এর মানে কি ?

রঞ্জন চায়ের পেয়ালাটাও সরাইয়া দিয়াছিল, এখন আবার কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে একবার চুমুক দিল; মুখে হাসি আনিয়া যথাসম্ভব সহজস্বরে বলিল—

রঞ্জন : বললুম তো বাবা, কিছু নয়—

প্রতাপবাবুর ধৈর্য্য ক্রমশ ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তিনি হঠাৎ

টেবিলের উপর একটা কীল মারিলেন। চায়ের বাসনগুলি সশব্দে নাচিয়া উঠিল।

প্রতাপ : নিশ্চয় কিছু। আমি শুনতে চাই।

রঞ্জনের মুখ গম্ভীর হইল, সে কিছুক্ষণ প্রতাপের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন : বাবা, কেদার রায় বলে কাউকে তুমি চেনো ?

প্রতাপ চেয়ার ছাড়িয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ : কেদার ! সেই বেল্লিক হনুমানটা ?

(তিনি আবার দৃঢ়ভাবে বলিলেন) হ্যাঁ, চিনতুম তাকে পঁচিশ বছর আগে ! কিন্তু সে উল্লুকটার কথা কেন ?

রঞ্জন ক্লান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন : না, কিছু নয়। এখানে তাঁর মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—

প্রতাপ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিট্‌কাইয়া দাঁডাইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ : কি বললি—সেই ক্যাদার বোম্বেটের মেয়ের সঙ্গে তোর আলাপ ! আস্পর্দ্ধা কম নয় তো ক্যাদারের ! আমার ছেলেকে ফাঁসাতে চায়—

ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের স্বরে রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন : বাবা, তুমি ভুল করছ—তিনি—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রতাপ গর্জ্জিতে আরম্ভ করিলেন—

রঞ্জন : হ'তে পারে না, হ'তে পারে না—

তিনি উন্মত্তবৎ হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; তারপর রঞ্জনের নিরীহ স্কন্ধে গদার মত বাহু সজোরে নিপাতিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন—

প্রতাপ : রঞ্জন, তুই যদি বাপের ব্যাটা হোস, আর কখনও ওর বাড়ীতে মাথা গলাবি নে—

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

রঞ্জন : না বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কেদারবাবু বলেছেন, তাঁর বাড়ীতে মাথা গলালেই তিনি আমার মাথা ফাটিয়ে দেবেন।

প্রতাপ আবার দাপাদাপি করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ : কী! এতবড় আস্পর্দ্ধা—আমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেবে। দেখে নেবো—পুলিশে দেবো হতভাগা নচ্ছারকে—

দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনও লাভ নাই দেখিয়া রঞ্জন বাড়ীর ভিতর দিকে চলিল। প্রতাপ হাঁকিলেন—

প্রতাপ : শোন্!

রঞ্জন ফিরিল।

প্রতাপ : কাল রাত্রের গাড়ীতে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব—

রঞ্জন : (উদাস কণ্ঠে) বেশ!

রঞ্জন আবার গমনোদ্যত হইল।

প্রতাপ : আমি রাজার বাড়ীতে তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি।

রঞ্জন অধর দংশন করিল।

রঞ্জন : বিয়ে আমি করব না বাবা।

প্রতাপ : করবি না! (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) আচ্ছা সে দেখা যাবে। কলকাতায় চল্ তো আগে। এ বুনো যায়গায় আর নয়, কালই রাত্রের গাড়ীতে।

রঞ্জনের মুখে চোখে একটা চকিত চিন্তার ছায়া পড়িল। সে অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিল—

রঞ্জন : কাল রাত্রের গাড়ীতে—

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

পরদিন অপরাহ্ণ। রঞ্জন নিজের ঘরে বসিয়া খানিকটা রবার ও একটা দ্বিভুজ পেয়ারার ডাল দিয়া গুল্‌তি তৈয়ার করিতেছে। কাজটা যে সে গোপনে সম্পন্ন করিতে চায় তাহা তাহার দ্বারের দিকে সতর্ক নজর হইতে প্রমাণিত হয়।

গুল্‌তি প্রস্তুত শেষ করিয়া সে রবার টানিয়া পরীক্ষা করিল, ঠিক হইয়াছে। একটা কাগজ গুলি পাকাইয়া গুল্‌তিতে সংযোগ করিয়া অদূরস্থ ড্রেসিং টেবিলে রক্ষিত একটি প্ল্যাস্টারের পরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। পরী টলিয়া পড়িলেন।

সন্তুষ্ট হইয়া রঞ্জন গুল্‌তি পকেটে রাখিল; তারপর দ্বারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

চিঠি লেখা হইলে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া রঞ্জন উঠিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে চলিল।

কাট্।

এই বাড়ীরই আর একটা ঘরে প্রতাপ রেল-জার্নির উপযুক্ত সাজ-পোষাক করিয়া অত্যন্ত অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। ঘরের একটা জানালা বাগানের দিকে। সেই জানালা হইতে দরজা পর্যন্ত পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরাজের মত যাতায়াত করিতে করিতে প্রতাপ মাঝে মাঝে জেব-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিতেছেন।

একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘড়ি দেখিলেন; তারপর বিরক্তভাবে নিজ মনেই বিড়্ বিড়্ করিলেন—

প্রতাপ: সময় যেন কাটতে চায় না। এখনও ট্রেণের সময় হতে—পাঁচ ঘণ্টা।

হঠাৎ জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়িতেই প্রতাপ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলেন; তারপর জানালার গরাদ ধরিয়া অপলক-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জানালার বাহিরে কিছুদূরে একটা মেত্তির ঝাড়ের বেড়া বাড়ীর সমান্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। প্রতাপ দেখিলেন, বেড়ার ওপারে সন্তর্পণে গা ঢাকিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছে। তাহার মুখ বা দেহ পাতার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; কেবল ঝাড়ের পত্রবিরল তলার দিক দিয়া সঞ্চারমান পদযুগল দেখা যাইতেছে। পদযুগল যে কাহার তাহা প্রতাপের চিনিতে বিলম্ব হইল না।

যতক্ষণ দেখা গেল প্রতাপ পদযুগল দেখিলেন; তারপর চক্ষু

চক্রাকার করিয়া চিন্তা করিলেন। গালের আঁবটি ধরিয়া টিপিতে টিপিতে তাঁহার মাথায় একটা কূটবুদ্ধির উদয় হইল, চাদর কাঁধে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

কাট্।

বাড়ীর ফটকের ঠিক অভ্যন্তর। ফটকের পাশে দরোয়ানের কুঠুরি, তাহার পাশে গারাজ-ঘর। একজন গুর্খা দরোয়ান রঞ্জনের মোটর বাইক বাহির করিয়া আনিতেছে; রঞ্জন ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

মোটর বাইক রঞ্জনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গুর্খা দরোয়ান দুই পা জোড় করিয়া স্যালুট্ করিল। রঞ্জন গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়া স্টার্ট দিতে গিয়া থামিয়া গেল। শব্দ করা হয় তো নিরাপদ হইবে না, এই ভাবিয়া সে নামিয়া পড়িল। মাথা নাড়িয়া বলিল—

রঞ্জন : না, হেঁটেই যাব।

বলিয়া মোটর বাইক আবার দরোয়ানকে প্রত্যর্পণ করিয়া রঞ্জন দ্রুত পদক্ষেপে ফটক হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

বাগানের একটি ঝাউগাছের আড়ালে প্রতাপ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; রঞ্জন বাহির হইয়া যাইবার পর তিনি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিলেন; তারপর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন দরোয়ান গাড়ীটা আবার গারাজে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি চাপা গলায় ডাকিলেন—

প্রতাপ : এই! স্‌স্‌!

গুর্খা দরোয়ান পিছু ফিরিয়া মালিককে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জোড় পদে স্যালুট্ করিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রতাপ : ছোটবাবু কোন্ দিকে গেল ?

দরোয়ান হিটলারি কায়দায় হস্ত প্রসারিত করিয়া রঞ্জন যেদিকে গিয়াছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিল। প্রতাপ আবার তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রচরণে ফটক পার হইয়া সেই পথ ধরিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

ঝাঝার একটি পথ। দুই-চারিটি পথিক দেখা যায়। রঞ্জন পথের মাঝখান দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বহুদূর পশ্চাতে প্রতাপ রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া নিজেকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছেন।

ক্রমে রঞ্জন দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল; প্রতাপ কাছে আসিতে লাগিলেন। একটা কুকুর তাঁহার সন্দেহজনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাঁহার পিছু লইল। উত্যক্ত হইয়া শেষে প্রতাপ একটি ঢিল কুড়াইয়া লইয়া কুকুরের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কুকুর পলায়ন করিল।

ডিজল্‌ভ্।

কেদারবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলি গিয়াছে। কলিকাতার গলি নয়; পদতলে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দুই

পাশে ফণি-মনসার ঝাড। ঝাড়ের অপর পাশে বাগান-ঘেরা বাড়ী।

রঞ্জন সাবধানে এই গলির একটা মনসা-বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে কেদারবাবুর দ্বিতল বাড়ীর পার্শ্বভাগ। রঞ্জনের দৃষ্টি অনুসরণ করিলে একটি জানালা চোখে পড়ে। দ্বিতলের জানালা, গরাদ নাই, কিন্তু কাঁচের কবাট বন্ধ।

কাট্।

দ্বিতলের ঘরে মঞ্জুর শয়ন কক্ষ। নানাপ্রকার ছোট-খাট মেয়েলি-আসবাব চোখের প্রীতি সম্পাদন করে। ঘরটি কিন্তু বর্ত্তমানে ঈষদন্ধকার

মঞ্জু নিজের শয্যার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দু হাতে রঞ্জনের ছবিখানি সম্মুখে মাথার বালিসের উপর ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছে। তাহার মুখখানি অত্যন্ত বিরস।

দেখিতে দেখিতে তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিল, অশ্রুনিবোধের চেষ্টায় ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়াও কোনও ফল হইল না, ছবির উপর মাথা রাখিয়া মঞ্জু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

কাট্।

রঞ্জন জানালার দিকে তাকাইয়া ছিল, সেখান হইতে দৃষ্টি নামাইয়া মাটিতে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। তারপর একটি ছোট নুড়ির মত পাথর কুড়াইয়া লইয়া পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহাতে মোড়কের মত মুড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রতাপবাবু কিয়দ্দূর পশ্চাতে বেড়ার পাশে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন; উৎকণ্ঠিতভাবে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিতেই তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ফণিমনসার কাঁটা ফুটিল। তিনি চকিতে আবার খাড়া হইলেন।

রঞ্জন গুল্‌তি বাহির করিয়া তাহাতে নুড়িটি বসাইয়াছিল, এখন অতি যত্নে জানালার দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া নুড়ি নিক্ষেপ করিল।

জানালার একটা কাচ ভাঙিয়া নুড়ি ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাট্।

মঞ্জু ঘরের মধ্যে পূর্ব্ববৎ কাঁদিতেছিল, কাচ ভাঙার শব্দে মুখ তুলিল। কাচ ভাঙা জানালা হইতে তাহার চক্ষু মেঝের উপর নামিয়া আসিল; কাগজ মোড়া নুড়িটি দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সেটি কুড়াইয়া লইল।

চিঠিতে লেখা ছিল—

"মঞ্জু, আজ আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি, আমারও বাবা এসেছেন। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। যে পাথরের আড়ালে রোজ আমাদের দেখা হত, সেইখানে আমি অপেক্ষা করব। তুমি আসবে কি?

তোমার রঞ্জন"

চিঠি পড়া শেষ হইয়া যাইবার পরও মঞ্জু চিঠি হাতে ধরিয়া তেম্‌নিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; চিঠিখানা স্খলিত হইয়া মেঝেয় পড়িল। মঞ্জু অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—

মঞ্জু: একবার—শেষবার—

কাট্‌।

বেড়ার ধারে রঞ্জন ব্যগ্র ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছে।

জানালা খুলিয়া গেল, মঞ্জুর পাংশু মুখখানি দেখা গেল। নিম্নাভিমুখে তাকাইয়া সে কিছুক্ষণ রঞ্জনকে দেখিল, তারপর আস্তে আস্তে সম্মতিজ্ঞাপক ঘাড নাড়িল।

ডিজল্‌ভ্‌।

দ্বিতলে মঞ্জুর শয়নকক্ষের দরজার সম্মুখে কেদারবাবু দাঁডাইয়া আছেন, দরজা ভেজানো রহিয়াছে। কেদারের মুখে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণতা। মঞ্জুর মনে দুঃখ দিয়া তিনিও সুখী নন।

কেদার দ্বারে মৃদু টোকা দিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না। দ্বিতীয়বার টোকা দিয়াও যখন জবাব পাওয়া গেল না, তিনি ডাকিলেন।

কেদার: মঞ্জু!

এবারও সাড়া নাই। কেদার তখন উদ্বিগ্নমুখে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে কেহ নাই। কেদার বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাইলেন। ভাঙা জানালাটা চোখে পড়িল; তারপর মেঝেয় চিঠিখানা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন।

চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ ভীষণাকৃতি ধারণ করিল ; তিনি সেটা মুঠির মধ্যে তাল পাকাইয়া গলার মধ্যে হুঙ্কার দিলেন, তারপর দ্রুতবেগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। মিহির জাপানী ছন্দে হেলিতে দুলিতে ফটক দিয়া প্রবেশ করিতেছিল, হঠাৎ সম্মুখ হইতে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া প্রায় টাউরি খাইয়া পড়িল। কেদারবাবু ক্রুদ্ধ বন্য মহিষের মত তাহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মিহির কোনও মতে সামলাইয়া লইয়া চক্ষু মিটি মিটি করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্ব্বত্য স্থান। যে পাথরের ঢিবিটার উপর রঞ্জন ও মঞ্জু প্রথম দিন আরোহণ করিয়াছিল, তাহারই তলদেশে একটা পাথরে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জন প্রতীক্ষা করিতেছে। যেদিক দিয়া মঞ্জু আসিবে, তাহার অপলক দৃষ্টি সেইদিকে স্থির হইয়া আছে।

কাট্‌।

পার্ব্বত্য স্থানের আর এক অংশ। প্রতাপ একটা ঝোপের আড়াল হইতে অনিশ্চিতভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন—যেন কোন্ দিক্ দিয়া অগ্রসর হইলে অলক্ষ্যে রঞ্জনের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছেন না। শেষে তিনি ঝোপের আড়ালে থাকিয়া বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাট্।

মঞ্জু আসিতেছে। যেস্থানে সাধারণত তাহাদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত সেখান হইতে সিধা রঞ্জনের দিকে আসিতেছে। শুষ্ক মুখে করুণ আগ্রহ; চুল ঈষৎ রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। সম্মুখ দিকে চাহিয়া চলিতে চলিতে সে একবার হোঁচট খাইল, কিন্তু তাহা জানিতেও পারিল না।

রঞ্জন মঞ্জুকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে কাছে আসিতেই দুই হাত বাড়াইয়া হাত ধরিল।

দু'জনে পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; মুখে কথা নাই। দু'জনের চোখেই আশাহীন ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা! মঞ্জুর শ্বাস একটু দ্রুত বহিতেছে। অবশেষে রঞ্জন ধরা ধরা গলায় বলিল--

রঞ্জন: মঞ্জু! এই আমাদের শেষ দেখা—আর দেখা হবে না।

মঞ্জু হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নীরবে মাথা নাড়িয়া অন্য দিকে তাকাইয়া রহিল। রঞ্জন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

রঞ্জন: বেশ, দেখা না হোক। কিন্তু তুমি চিরদিন আমাকে এমনি ভালবাসবে?

মঞ্জু রঞ্জনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল—

মঞ্জু: বাসবো। আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

রঞ্জন দৃঢ়মুষ্টিতে হাত ধরিয়া তাহাকে আরও একটু কাছে টানিয়া আনিল।

কাট্।

পাথরের পশ্চাতে কিছুদূরে অসমতল কঙ্করপূর্ণ জমির উপর দিয়া কেদার হামাগুঁড়ি দিয়া চলিয়াছেন।

কাট্।

মঞ্জু ও রঞ্জন। দু'জনের চক্ষু যেন পরস্পরের মুখের উপর জুড়িয়া গিয়াছে। রঞ্জন একটু মলিন হাসিল।

রঞ্জন : আমরা কেউই নিজের বাবার মনে দুঃখ দিতে পারব না; তা যদি পারতুম আমরা নিজেরা খেলো হয়ে যেতুম, আর আমাদের ভালবাসাও তুচ্ছ হয়ে যেত—

মঞ্জুর চোখে আরতি প্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

মঞ্জু : কেমন ক'রে তুমি আমার মনের কথা জানলে?

রঞ্জন : তোমার মনের কথা আর আমার মনের কথা এক হয়ে গেছে মঞ্জু।

কাট্।

প্রতাপ কঙ্করপূর্ণ ভূমির উপর হামাগুঁড়ি দিতেছেন।

কাট্।

মঞ্জু বিদায় চাহিতেছে। তাহাদের হাতে হাত আঙুলে আঙুল শৃঙ্খলিত হইয়া আছে, রঞ্জন এখনও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না। মঞ্জু রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু : এবার ছেড়ে দাও।

ধীরে ধীরে রঞ্জনের অঙ্গুলির শৃঙ্খল শিথিল হইয়া গেল; মঞ্জু স্খলিতপদে অশ্রু-অন্ধ নয়নে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। চোখে অপরিসীম বিয়োগ-ব্যথা লইয়া রঞ্জন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মঞ্জু চলিয়া যাইতেছে ; যাইতে যাইতে একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল, আবার চলিতে লাগিল।

কাট্।

কঙ্করপূর্ণ স্থান। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে হামাগুঁড়ি দিয়া প্রতাপ ও কেদার প্রবেশ করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

তারপর কাছাকাছি পৌছিয়া দুজনে একসঙ্গে মুখ তুলিয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল ; পঁচিশ বৎসরের অদর্শন সত্ত্বেও চিনিতে বিলম্ব হইল না।

দুইটি অপরিচিত কুকুর পথে সাক্ষাৎকার ঘটিলে যেমন দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া গূঢ় গর্জ্জন করে, ইহারাও তদ্রূপ গর্জ্জন করিলেন ; তারপর চতুষ্পদ ভাব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার প্রথম কথা কহিলেন।

কেদার : এঁ—ঃ! তুই! আমার বোঝা উচিত ছিল যে এ একটা নচ্ছার উল্লুকের কাজ।

প্রতাপ : চোপ-রও ভাল্লুক কোথাকার! আমার ছেলে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিস।

যুযুৎসুভাবে উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

কেদার : (সচীৎকারে) ফাঁদ পেতেছি! দাঁড়া রে নচ্ছার, তোর ছেলেকে পেলে তার হাড় এক ঠাঁই—মাস এক ঠাঁই করব। এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার মেয়েকে চিঠি লেখে!

প্রতাপ : (আস্ফালন করিতে করিতে) তবে রে বেঁড়ে ওস্তাদ!

মারবি আমার ছেলেকে! পুলিশ ডেকে তোকে হাজতে না পুরি তো আমার নাম প্রতাপ সিংগিই নয়—

কাট্!

রঞ্জন যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল; রুমাল বাহির করিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। মুছিতে মুছিতে হঠাৎ থামিয়া সে শুনিতে লাগিল, অনতিদূর পশ্চাৎ হইতে কর্কশ কলহের আওয়াজ আসিতেছে।

রঞ্জনের বিস্মিত মুখের ভাব ক্রমশ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

কাট্।

কেদার ও প্রতাপ। তাঁহাদের দ্বন্দ্ব ক্রমে সপ্তমে চড়িতেছে।

কেদার: শয়তানি করবার আর জায়গা পাস্ নি—হতভাগ্য হাতী—

প্রতাপ: বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—রাস্কেল রামছাগল!

কাট্।

রঞ্জন শুনিতেছিল; এতক্ষণে কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তাহার মাথার চুল প্রায় খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার বিবর্ণ মুখ হইতে বাহির হইল—

রঞ্জন: বাবা! কেদারবাবু!

কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া রঞ্জন কিছুক্ষণ হাত কচ্লাইল; তারপর দ্বিধাভরে মল্লভূমির দিকে চলিল।

কাট্।

পথ বেঁধে দিল

কেদার যথাযোগ্য হস্ত আস্ফালন সহকারে বলিতেছেন—

কেদার : ইচ্ছে করে এক চড় মেরে তোর আব্-শুদ্ধ গালটা চ্যাপ্টা ক'রে দিই।

প্রত্যুত্তরে প্রতাপ কেদারের মুখের সিকি ইঞ্চি দূরে নিজের বদ্ধ মুষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : ইচ্ছে করে একটি ঘুঁষি মেরে তোর দাঁতের পাটি উড়িয়ে দিই।

কেদার উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য বাহির না হইয়া সহসা আর্ত্ত কাতরোক্তি নির্গত হইল। তিনি হাত দিয়া গাল চাপিয়া ধরিলেন।

কেদার : অ্যা—উ! উ হু হু হু—আ রে রে রে রে—

যন্ত্রণায় তিনি মাটির উপর সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলেন ; নিজের মুষ্টির দিকে উদ্বিগ্ন সংশয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন—হয় তো অজ্ঞাতসারে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বসিয়াছেন। কেদারবাবুর আক্ষেপোক্তি হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিল। তখন প্রতাপ ধমক দিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি হয়েছে—কাঁদছিস কেন ? আমি তোকে মেরেছি—মিথ্যেবাদী কোথাকার ?

কেদার : আরে রে রে রে রে—দাঁত রে লক্ষ্মীছাড়া—দাঁত—রে রে রে রে—

প্রতাপ কণ্টকবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ : দাঁত ?

কেদারের স্কন্ধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি বল্‌লি—দাঁত ? দাঁত ব্যথা করছে ?

কেদার : হাঁ রে বোম্বেটে—দন্তশূল ! নইলে তোকে আজ—হু হু হু—

প্রতাপ : দন্তশূল ! এতক্ষণ বলিস্ নি কেন রে গাধা ?

ত্বরিতে পকেট হইতে গুলি বাহির করিয়া তিনি কেদারের সম্মুখে ধরিলেন।

প্রতাপ : এই নে—খেয়ে ফ্যাল। দু'মিনিটে যদি তোর দন্তশূল সেরে না যায় আমার নামই প্রতাপ সিংগি নয়—

কেদার সন্দিগ্ধভাবে বড়ি নিরীক্ষণ করিলেন।

কেদার : এঁ: ? খুনে কোথাকার, বিষ খাইয়ে মারবার মৎলব ? অ্যা—উ !

কেদার হাঁ করিতেই প্রতাপ বড়ি তাঁহার মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

প্রতাপ : নে—খা। আহাম্মক—

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বেই কেদার বড়ি গিলিয়া ফেলিলেন।

কাট্।

রঞ্জন অনিশ্চিত পদে অগ্রসর হইতেছিল; তাহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ। কিছু দূরে আসিয়া সে একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। কলহের কলস্বরে মন্দা

পড়িয়াছে ; কেদারবাবু থাকিয়া থাকিয়া কেবল একটু কুন্থন করিতেছেন। রঞ্জন অন্তরালে দাঁড়াইয়া সবিস্ময় আগ্রহে দেখিতে লাগিল।

কাট্।

দুইটি টিবির উপর কেদার ও প্রতাপ বসিয়া আছেন। কেদারের মুখ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি ; তাঁহার দন্তশূল যে এমন মন্ত্রবৎ উড়িয়া যাইতে পারে তাহা যেন তিনি ধারণাই করিতে পারিতেছেন না ; বিহ্বলভাবে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রতাপের দিকে আড়-চক্ষে তাকাইতেছেন। প্রতাপের মুখে বিজয়-দীপ্ত হাসি সুপরিস্ফুট। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রতাপ মস্তকের ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

প্রতাপ : কি বলেছিলুম ? সারলো কি না ?

কেদার মিন্ মিন্ করিয়া বলিলেন—

কেদার : আশ্চর্য্য ওষুধ ! কোথায় পাওয়া যায় ?

প্রতাপ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ : হেঃ হেঃ হেঃ—এ আমার তৈরি ওষুধ। চালাকি নয়, নিজে আবিষ্কার করেছি—

কেদার : (ঘোর অবিশ্বাসভরে) আবিষ্কার করেছিস ! তুই ?

প্রতাপ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি না তো কে ?

তিনি উঠিয়া গিয়া কেদারের টিবির উপর বসিলেন।

প্রতাপ : এর নাম হচ্ছে বৃহৎ দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা। বুঝ্লি ? এই বড়ি বার ক'রে সতের লাখ টাকা করেছি—

কেদার একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কেদার : বলিস্ কি! আমি যে অভ্রের খনি ক'রে মোটে এগারো লাখ করেছি—

প্রতাপ সপ্রশংস নেত্রে কেদারের পানে তাকাইলেন।

প্রতাপ : তাই নাকি! তা এগারো লাখ কি চাট্টিখানি কথা না কি! কটা লোক পারে?

তিনি কেদারের পিঠে প্রশংসা-জ্ঞাপক চপেটাঘাত করিলেন। কেদারের মুখে সহসা হাসি ফুটিল।

কাট্।

রঞ্জন পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; তাহার মুখ অপরিসীম আনন্দে যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এই সময় কেদার ও প্রতাপ উভয়ের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ ভাসিয়া আসিল।

রঞ্জন পা টিপিয়া টিপিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল; তারপর পিছু ফিরিয়া সোজা দৌড় দিল। দৌড়িতে দৌড়িতে সে যে "মঞ্জু" "মঞ্জু" উচ্চারণ করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না।

কাট্।

কেদারবাবুর গৃহের ফটকের সম্মুখ। মঞ্জুর মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্জু ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল; পশ্চাতে মিহির।

মিহির : চল্‌লেন? একটা জাপানী কবিতা লিখেছিলুম—

মঞ্জু মোটরের চালকের সীটে প্রবেশ করিতে করিতে ভারী গলায় বলিল—

মঞ্জু : মাফ করবেন মিহিরবাবু, আমার সময় নেই। হ্যাঁ,

বাবা এলে বলে দেবেন, তাঁর জন্যে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর চিঠি রেখে গেলুম—

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়া মঞ্জু চলিয়া গেল। মিহির করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাট।

রঞ্জনের বাড়ীর ফটক। গুর্খা দরোয়ান স্বস্থানে দণ্ডায়মান আছে। রঞ্জন দৌড়িতে দৌড়িতে বাহির হইতে প্রবেশ করিতেই দারোয়ান পদযুগল সশব্দে জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন: দরোয়ান, জলদি—জলদি ফটফটিয়া নিকালো—

দরোয়ান স্যালুট করিয়া মোটর বাইক আনিবার জন্য প্রস্থান করিল। রঞ্জন নিজের উৎফুল্ল অথচ ঘর্মাক্ত মুখখানা রুমাল দিয়া মুছিতে লাগিল।

কাট।

টিবির উপর পরস্পরের স্কন্ধ জড়াজড়ি করিয়া প্রতাপ ও কেদার বসিয়া আছেন; উভয়েরই চক্ষু আর্দ্র। পুনর্মিলনের অকাল বর্ষা দু'জনেরই মন ভিজাইয়া দিয়াছে।

কেদার: (নাক টানিয়া) ভাই, আমি কি মিছামিছি তোর ওপর রাগ করছিলুম? তুই আমাকে 'কদু রায়' বলেছিলি কেন? আমার নামটাকে বেঁকিয়ে অমন ক'রে ডাকা কি তোর উচিত হয়েছিল?

প্রতাপ: ভাই, তুইও তো আমাকে 'আবু হোসেন' বলেছিলি। আমার গালে আব আছে বলে আমাকে আবু হোসেন বলা কি বন্ধুর কাজ হয়েছিল?

কেদার : (চক্ষু মুছিয়া) যেতে দে ওসব পুরানো কথা—চল্ বাড়ী যাই।

উভয়ে উঠিলেন।

প্রতাপ : আগে আমার বাড়ীতে তোকে যেতে হবে কিন্তু।

কেদার : না, আমার বাড়ীতে আগে—

উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কেদার : আমার মেয়েকে তো তুই এখনও দেখিস্ নি। (সগর্ব্বে) অমন মেয়ে আর হয় না—

প্রতাপ : (গর্ব্বোদ্দীপ্ত কণ্ঠে) আর আমার ছেলে? তুই তো দেখেছিস—কেমন ছেলে?

সন্তানগর্ব্বে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া হাস্য করিতে করিতে চলিলেন।

কাট্।

কেদারবাবুর ফটকের সম্মুখ। রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সিঁড়ির উপর মিহির বিমর্ষভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে।

রঞ্জন : মিহিরবাবু! মঞ্জু কোথায়?

মিহির : (বিরস কণ্ঠে) তিনি মোটরে চড়ে চলে গেলেন। আমার জাপানী কবিতা শুনলেন না—

রঞ্জন : চলে গেলেন? কোথায় চলে গেলেন?

মিহির : তা জানি না। ঐ দিকে। আপনি শুনবেন কবিতা—

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না; লাফাইয়া গিয়া গাড়ীতে চড়িল।

রঞ্জন : আর এক সময় হবে।

তাহার মোটর-বাইক তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড। মঞ্জুর মোটর কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। মঞ্জু চালকের আসনে বসিয়া; তাহার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির হইয়া আছে; ঠোঁট দুটি দৃঢ়বদ্ধ।

কাট্।

রঞ্জনের গাড়ী ঝাঝার সীমানা পার হইয়া গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িল। গাড়ী উল্কার বেগে ছুটিয়াছে। একটা গ্রাম্য-কুকুর কিছুদূর পর্য্যন্ত ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল, তারপর হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

কাট্।

বাড়ীর সম্মুখের বারান্দায় মিহির, কেদার ও প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছেন। কেদার বড়ই ঘাব্ড়াইয়া গিয়াছেন।

কেদার : অ্যাঁ—চলে গেছে! কোথায় চলে গেছে?

মিহির : তা তো জানি না—কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনবাবু এলেন, তিনিও খবর পেয়ে মঞ্জু দেবীর পিছনে মোটর বাইক ছোটালেন।

কেদার ও প্রতাপ উদ্বিগ্নভাবে মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন।

মিহির : মঞ্জু দেবী আপনার জন্যে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর চিঠি রেখে গেছেন—

কেদার : (খিঁচাইয়া) এতক্ষণ তাবলনি কেন?—এস প্রতাপ।

দুজনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনাহূত মিহির আবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া গালে হাত দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখে সহসা প্রাণ-সঞ্চার হইল। ফটকের সম্মুখ দিয়া চারিটি তরুণী—ইন্দু, মলিনা, সলীলা, মীরা—যাইতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিরীহ বাড়ীটার দিকে তীব্র কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

তাঁহারা অন্তর্হিত হইতে না হইতেই মিহির চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দ্রুতপদে সিঁড়ি নামিয়া তরুণীদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

কাট্।

ড্রয়িং রুমে কেদার মঞ্জুর পত্রপাঠ শেষ করিয়া বিহ্বল ভাবে প্রতাপের পানে তাকাইলেন।

কেদার: কলকাতায় চলে গেছে!—কি করি প্রতাপ?

প্রতাপ আশ্বাস দিয়া কেদারের পৃষ্ঠে কয়েকটি মৃদু চপেটাঘাত করিলেন।

প্রতাপ: কিছু ভেবো না, আমার রঞ্জন তাকে ঠিক ফিরিয়ে আনবে। বোসো—

উভয়ে একটি সোফায় বসিলেন; কেদারের মন কিন্তু নিরুদ্বেগ হইল না।

কেদার: ছেলেমানুষের কাণ্ড—কিছু বোঝে না—আমাদের মত মাথা ঠাণ্ডা তো নয়। শেষে কি করতে কি করে বসবে—

প্রতাপ: আরে না না, কোনও ভয় নেই। আসল কথা দু'টোতে দু'জনের প্রেমে পড়ে গেছে—ভীষণভাবে।

কেদার: হুঁ—দুটোই বেহায়া। সেই তো হয়েছে ভাবনা। —কি করা যায় এখন!

প্রতাপ ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, বোধ করি মনে মনে রাজ-কন্যাকে পুত্রবধূ করিবার উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। তারপর কেদারের উরুর উপর একটা চাপড় মারিলেন।

প্রতাপ: ঠিক হয়েছে! এক কাজ করি এসো—

কেদার সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন।

প্রতাপ: ও দুটোর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক!

কিছুক্ষণ পরস্পর তাকাইয়া রহিলেন। তারপর উভয়ে একটু হাসিলেন; হাসি ক্রমে প্রসারলাভ করিল। শেষে উভয়ে পরস্পর হাত ধরিয়া দীর্ঘকাল কর-কম্পন করিতে লাগিলেন।

কাট্।

মঞ্জুর গাড়ী চলিয়াছে।

মঞ্জুর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট কাঁপিতেছে; মুখের বাহ্য দৃঢ়তা আর রক্ষা হইতেছে না।

সহসা সে চলন্ত গাড়ীর স্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটিতে পাইল না; গাড়ী স্বেচ্ছানুযায়ী কিছু দূর গিয়া ক্রমে মন্দবেগ হইয়া অবশেষে থামিয়া গেল।

মঞ্জু অশ্রু-ধৌত মুখ তুলিয়া দেখিল গাড়ী নিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে সেল্ফ্-স্টার্টার দিয়া গাড়ীর শরীরে প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা করিল, কিন্তু এঞ্জিনের স্পন্দন পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিল না।

ব্যর্থ হইয়া মঞ্জু গাড়ী হইতে নামিবার উপক্রম করিল।

কাট্।

রঞ্জনের মোটর-বাইক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে।

কাট্।

মঞ্জু একান্ত ম্রিয়মাণ মুখচ্ছবি লইয়া মোটরের ফুটবোর্ডে বসিয়া আছে। তার যেন আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।

দূরে অস্পষ্ট ফট্ ফট্ শব্দ শোনা গেল; ক্রমে শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মঞ্জু প্রথমটা কান করে নাই; তারপর সচকিতে ঘাড় তুলিয়া সেইদিকে তাকাইল।

দূরে রঞ্জনের মোটর বাইক আসিতেছে দেখা গেল। শব্দ ও গাড়ী নিকটতর হইতে লাগিল। শেষে রঞ্জনের মোটর-বাইক মঞ্জুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিল, মুখ গম্ভীর। কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে দু'জনের পানে তাকাইয়া রহিল।

রঞ্জন: গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে?

মঞ্জু উত্তর দিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িল।

রঞ্জনের অধর প্রান্ত একটু নড়িয়া উঠিল।

রঞ্জন: আমি জানি কি হয়েছে—পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে—

মঞ্জু অধর দংশন করিয়া অধোমুখে রহিল।

রঞ্জন উঠিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। মঞ্জু চোখ তুলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু: আবার কেন এলে?

রঞ্জন গম্ভীরভাবে একটু হাসিল।

রঞ্জন : তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম। তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার আবার ভাব হয়ে গেছে—ভীষণ ভাব।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া মঞ্জু আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু : কি—কি বললে ?

রঞ্জন আর গাম্ভীর্য্যের অভিনয় বজায় রাখিতে পারিল না, অন্তরের চাপা উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। সে দু'হাতে মঞ্জুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন : যা বললুম—দুজনে একেবারে হরিহর আত্মা! চল, ফিরে যেতে যেতে সব বলব।

ডিজল্‌ভ্।

মঞ্জুর গাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। রঞ্জনের মোটর বাইক তাহার পিছনের সীটে উঁচু হইয়া আছে।

রঞ্জন গাড়ী চালাইতেছে। পাশে মঞ্জু। মঞ্জুর মাথাটি রঞ্জনের স্কন্ধের উপর আশ্রয় লইয়াছে, চক্ষুদুটি পরিতৃপ্তির আবেশে স্বপ্নাতুর।

রঞ্জন একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; তারপর মঞ্জুর নরম চুলের মধ্যে নিজের গাল রাখিয়া সস্নেহে একটু নাড়া দিল। মঞ্জু সুখাবিষ্ট চোখ তুলিল।

ফেড আউট্।

অভিসার

আরম্ভ

ঝুম ঝুম করিয়া নূপুর বাজিতেছে।

কৃষ্ণবর্ণ চিত্রপটের উপর একটি প্রদীপের শিখা দেখা দিল। প্রদীপ শিখাটি ধীরে ধীরে নড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই আলোকে চিত্রপটে লিখিত হইল—

'অভিসার'

সম্পূর্ণ লিখিত হইবার পর বাতাসে আলোর শিখা কাঁপিতে লাগিল; তারপর সহসা নিবিয়া গেল।

নূপুর ধ্বনি চলিতেছে।

ফেড্ ইন্।

ক্যামেরার চক্ষু ধীরে ধীরে খুলিতেছে।

ক্লোজ্ শট্।

রাত্রিকাল। কেবল একটি অতি সুন্দর রমণীর মুখ প্রদীপের আলোকে দেখা যাইতেছে। রমণী আলোর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ক্যামেরার চক্ষু পূর্ণ খুলিয়া গেল।

শয়ন কক্ষ। রমণী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে। ঊর্দ্ধাঙ্গে কেবলমাত্র কাঁচুলি; কটিতটে নীলাম্বর। বাহু ও কবরীতে পুষ্পভূষা। একটি বিগতযৌবনা কিন্তু সুশ্রী দাসী নতজানু হইয়া রমণীর পায়ে নূপুর পরাইয়া দিতেছে। দাসীর মুখের পার্শ্বভাগ দেখা যাইতেছে।

দাসী : (নূপুর পরাইতে পরাইতে) এই শ্রাবণ মাসের রাত্রে অভিসার ! বলিহারি যাই ।

রমণী শয্যা হইতে একটি স্বর্ণ মুকুর তুলিয়া লইয়া নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে মৃদু হাসিল ।

রমণী : এই তো অভিসারের সময়—

(সুরে) কাজর-রুচিহর রয়ণী বিশালা
তছু পর অভিসার করু নব বালা ।

দাসী নূপুর পরানো শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ।

মিড্ ক্লোজ শট্ ।

দাসীর মুখের সম্মুখ ও রমণীর মুখের পার্শ্ব দেখা যাইতেছে । তাহাদের মধ্যস্থলে দীপদণ্ডে প্রদীপ ।

দাসী হাত নাড়িয়া কপট তিরস্কারের সুরে বলিল—

দাসী : তা যেন বুঝলুম । কিন্তু তুমি রাজনটী বাসবদত্তা, তোমার অভিসারে যাবার দরকারটা কী শুনি ? এম্নিতেই তো মথুরার নবীন নাগরিকেরা অষ্টপ্রহর তোমার দোরে ধরণা দিচ্ছে—

বাসবদত্তা : তাদের উপর অরুচি ধরে গেছে ।—আমার উর্ণা দে—

দাসী বাহির হইয়া গেল ।

বাসবদত্তা : চিরকাল সবাই আমাকে চেয়েছে, আমার পায়ে লুটিয়েছে—(অরুচিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া) ওদের আর সইতে পারি না—

বাসবদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী বাসবদত্তার পিছন দিক হইতে প্রবেশ করিল এবং একটি চুম্‌কিদার কালো ওড়না তাহার গায়ে জড়াইয়া দিতে লাগিল।

ক্লোজ শট্। বাসবদত্তার সম্মুখ হইতে।

বাসবদত্তা: (দীপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) তাই আজ অভিসারে চলেছি—দেখি এমন লোক আছে কিনা যাকে আমার মন চায়—

ক্লোজ আপ।

বাসবদত্তা দীপদণ্ড হইতে দীপ তুলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে লইল। পিছনের আধা-অন্ধকারে দাসীর অস্পষ্ট মুখ দেখা যাইতেছে।

দাসী: ও, তাই বল। তা—নতুন মানুষটি কে?

মিড শট্। সম্মুখ হইতে।

বাসবদত্তা। জানি না। তাঁকে খোঁজবার জন্যেই তো এই অভিসার—

প্রদীপ লইয়া বাসবদত্তা ধীরপদে অগ্রসর হইল। ক্যামেরা পিছাইতে লাগিল।

নূপুরের ঝুম ঝুম শব্দ।

ডিজল্‌ভ্।

নূপুরের শব্দ চলিতেছে।

লং শট্—উপর হইতে।

রাত্রি। মথুরার একটি সঙ্কীর্ণ পথ। আশে পাশের উচ্চ অট্টালিকা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাসবদত্তা প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে আসিতেছে।

মিড্ শট্। সমতল হইতে।

পথের একটা মোড। বাসবদত্তা মোড় ঘুরিয়া চলিয়াছে।

ট্র্যাক্। ক্যামেরা বাসবদত্তার পাশে পাশে।

তাহার চোখের দৃষ্টি চঞ্চল ও সাগ্রহ। সে চতুর্দিকে কুতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

সহসা নেপথ্যে শানাইয়ের সুরে বেহাগ বাজিয়া উঠিল। বাসবদত্তা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া উর্দ্ধে চাহিল।

মিড্ লং শট্। নিম্ন হইতে।

তোরণ শীর্ষ। এক প্রহরী দাঁড়াইয়া শানাই বাজাইতেছে। শানাইয়ের শব্দ।

ক্লোজ শট্। সম্মুখ হইতে।

প্রহরীর মুখে দ্বিধা-বিভক্ত গালপাট্টা দাড়ি। শানাইয়ে একপদ বাজাইয়া প্রহরী তাহার সম্মুখস্থিত বালু-ঘটিকা উল্টাইয়া বসাইয়া দিল। তারপর পিছন ফিরিতে গিয়া নিম্নাভিমুখে তাহার দৃষ্টি পড়িল। রেলিংয়ের উপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া প্রহরী ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিল।

মিড্ লং শট্। নীচের দিকে। তোরণ হইতে।

প্রহরীর পিঠ ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ অতিক্রম করিয়া নিম্নে পথের উপর বাসবদত্তা দীপহস্তে উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া আছে, দেখা যাইতেছে।

প্রহরী: (গম্ভীরকণ্ঠে) মধ্য রাত্রির প্রহর বাজল; এত রাত্রে কে যায়?

বাসবদত্তা : (গর্ব্বিতস্বরে) বাসবদত্তা।

ক্লোজ্ শট্। সম্মুখ হইতে।

প্রহরী সবিস্ময়ে সম্মুখে ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার দাড়ির মধ্যে হাসি দেখা দিল।

প্রহরী : নগর নটি, এত রাত্রে কোথায় যাও?

মিড্ ক্লোজ্ শট্। ঈষৎ পার্শ্ব হইতে।

বাসবদত্তা অবজ্ঞাস্ফুরিত অধরভঙ্গী করিল।

বাসবদত্তা : অভিসারে।

বাসবদত্তা চলিতে আরম্ভ করিল। নূপুরের শব্দ।

ডিজল্‌ভ্।

লং শট্।

রাত্রি। সম্মুখে মথুরাপুরীর প্রাকার দেখা যাইতেছে।

মিড্ শট্—ট্র্যাক্—ক্লোজ শট্।

প্রাকারের এক অংশ। পশ্চাৎপটে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর ঊর্দ্ধে ফ্রেমের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। একটি তরুণ ভিক্ষু প্রাকারতলে মাটিতে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার মাথা বাহুর উপর ন্যস্ত; পাশে দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র।

ক্রমে দূর হইতে নূপুরের শব্দ আসিতে লাগিল।

লং শট্—ক্রমে মিড্ লং শট্।

প্রাকারের পার্শ্ব হইতে সমান্তরালে। দূরে দীপ হস্তে বাসবদত্তা আসিতেছে। দীপের প্রভায় বাসবদত্তার মুখ ও পার্শ্বের প্রাচীর আলোকিত।

মিড্ শট্।

প্রাকার গাত্রে বাসবদত্তার ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া সঞ্চারমান। নূপুরের শব্দ স্পষ্টতর।

ক্লোজ্ শট্।

বাসবদত্তার পার্শ্ব হইতে। পশ্চাৎপটে প্রাকারের নিম্নাংশ। বাসবদত্তার সঞ্চারমান পদযুগল মাত্র দেখা যাইতেছে। পদসঞ্চারের তালে নূপুর ধ্বনি।

পদযুগল থামিল, যেন নিকটতর—পায়ে কিছু ফুটিয়াছে। ক্যামেরা স্থির, সামান্য উপর দিকে উঠিয়া বাসবদত্তার নিতম্ব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিল। সে সম্মুখে অবনত হইয়া পা হইতে কাঁটা তুলিয়া ফেলিয়া দিল। নত অবস্থায় তাহার সমগ্র দেহ ও মুখের পাশ দেখা গেল।

আবার পদযুগল চলিতে লাগিল।

ক্লোজ শট্।

পশ্চাৎপটে প্রাকারের নিম্নাংশ। ভিক্ষু পূর্ব্ববৎ ঘুমাইতেছে। নূপুর ধ্বনি কাছে আসিতেছে।

ট্র্যাক্। ক্যামেরা মিড্ শটে পিছাইয়া গেল।

বাসবদত্তা সুপ্ত ভিক্ষুর দিকে অগ্রসর। দীপের নীচে অন্ধকার, বাসবদত্তা সম্মুখস্থ ভূমির উপর কিছু দেখিতে পাইতেছে না, তাহার দৃষ্টি চক্ষুর সমান্তরালে।

বাসবদত্তার পা ভিক্ষুর বক্ষে ঠেকিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপ নত করিয়া নিম্নে চাহিল।

ক্লোজ আপ।

বাসবদত্তা নিম্নে তাকাইয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার মুখ বিস্ময়পূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ক্লোজ শট্।

বাসবদত্তা ভিক্ষুর পাশে নতজানু হইয়া বসিল; তারপর প্রদীপ তাঁহার মুখের একান্ত নিকটে লইয়া গিয়া হর্ষোৎফুল্ল একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁহার কমনীয় কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ক্লোজ আপ।

ভিক্ষু ও বাসবদত্তার মুখ। ভিক্ষুর চক্ষু মুদ্রিত। বাসবদত্তার চক্ষে লুব্ধ কামনা।

ভিক্ষু ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিলেন। দীপের আলোয় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল; তিনি চক্ষের সম্মুখে হস্ত সঞ্চালন করিলেন।

মিড্ ক্লোজ শট্।

ভিক্ষু এক কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঠিয়া ঈষৎ বিস্ময় মিশ্রিত প্রীতির চক্ষে বাসবদত্তার পানে চাহিলেন। বাসবদত্তার অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী দেখিয়া প্রশান্ত আনন্দে তাঁহার মুখ ভরিয়া গেল।

ভিক্ষু: দেবি, কে আপনি?

ক্লোজ শট্।

ভিক্ষু ও বাসবদত্তা পূর্ব্ববৎ। বাসবদত্তা লজ্জা ও বিভ্রমের অভিনয় করিয়া চক্ষু নত করিল।

বাসবদত্তা: আমি রাজনটী বাসবদত্তা। (চক্ষু তুলিয়া) আমাকে ক্ষমা করুন কুমার—না জেনে আপনার অঙ্গে পদস্পর্শ করেছি—

ভিক্ষু: (উঠিয়া বসিয়া সহাস্যে) তাতে কোনও অপরাধ

হয় নি কল্যাণী। আমি ভিক্ষু—আমার নাম উপগুপ্ত—(বাসবদত্তার সাজসজ্জা দেখিয়া মৃদু হাস্যে)—মনে হচ্ছে নগরলক্ষ্মী আজ কোনও ভাগ্যবানের উদ্দেশ্যে অভিসারে চলেছেন।

বাসবদত্তা লীলাবিলাস সহকারে উপগুপ্তের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

বাসবদত্তা ঃ কুমার, ধূলাতে যদি কেউ মাণিক কুড়িয়ে পায়, সে কি আর ধন রত্নের সন্ধান করে? এই কঠিন কঠোর ধরণীতল আপনার উপযুক্ত শয্যা নয়, কুমার। দয়া করে আমার গৃহে চলুন—

মিড্ শট্।

উপগুপ্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাসবদত্তাও দাড়াইল—তাহার মুখ আশায় উজ্জ্বল। উপগুপ্ত কিছুক্ষণ স্নিগ্ধচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

উপগুপ্ত ঃ আমি বুদ্ধের ভিক্ষু-ব্রহ্মচারী—

বাসবদত্তার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল; ত্বরিত-হস্তে সে উপগুপ্তের বাহুর উপর হাত রাখিল।

ক্লোজ আপ্।

উপগুপ্ত ধীরে ধীরে নিজ বাহু বাসবদত্তার হস্তমুক্ত করিলেন; তাহার মুখের পানে চাহিয়া করুণ সদয় কণ্ঠে কহিলেন—

উপগুপ্ত ঃ লাবণ্যময়ী, এখনও আমার সময় হয় নি। আজ তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—যে দিন সময় আসবে আমি আপনি তোমার—(ঈষৎ হাস্য)—

মিড্ শট।

উপগুপ্ত : কুঞ্জে যাব।

উপগুপ্ত নত হইয়া দণ্ড ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া লইলেন।

বাসবদত্তা ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। ভিক্ষু চলিবার উপক্রম করিয়া পার্শ্বে ফিরিলেন।

বাসবদত্তার বামহস্তে প্রদীপ সহসা নিবিয়া গেল। বাসবদত্তা চকিতে প্রদীপের পানে তাকাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র বিদ্যুতের প্রভায় তাহার মুখ যেন ঝলসিয়া গেল।

আকাশের শট্।

অন্ধকার ; পরে বিদ্যুৎ চমক।

মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বাতাসের হা হা ধ্বনি। সব মিলিয়া একটা ব্যঙ্গের অট্টহাসির মত শব্দ।

মিড্ লং শট্।

বৃষ্টি পড়িতেছে ; বিদ্যুৎ চমকিতেছে ; মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। বাসবদত্তা একাকী। সে ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহার সিক্ত বস্ত্র এলোমেলো বাতাসে উড়িতেছে।

বিদ্যুতের সবিশ্রাম আলোকে এই দৃশ্য পরিস্ফুট হইবে।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দ্রুত চটুল সঙ্গীতের সুর।

মিড্ শট।

দিন। প্রমোদ উদ্যানের এক অংশ; অগণিত বসন্তকালীন ফুল ফুটিয়া আছে। ভ্রমর উড়িয়া বেড়াইতেছে।

সঙ্গীতের সুর চলিতেছে। ক্রমে তাহাতে গানের কণ্ঠ মিলিল।

'এল বসন্ত সুন্দর—মরি মরি—'

মিড্ শট্।

প্রমোদ উদ্যানের অপর অংশ। একদল যুবতী গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে ও আবীর খেলিতেছে।

গীত

"এল বসন্ত সুন্দর—মরি মরি!
আবীর কুঙ্কুমের রঙ্গিল অম্বর—মরি মরি!
কিংশুক ফুল্লমুখী—পঙ্কজ তুল্যমুখী
মধু মলয় বায়ে ফুল-শরের ঘায়ে
তনু চঞ্চল থর থর—মরি মরি।"

ক্লোজ শট্।

যুবক যুবতীগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

ক্লোজ শট্। ভিন্ন দিক হইতে।

ঐ।

সহসা নেপথ্যে পটহ-ধ্বনি হইল। যুবকযুবতীগণ অর্দ্ধপথে থামিয়া নেপথ্যে চাহিল। পটহ থামিল। পটহ বাদকের স্বর শুনা গেল:

পটহ বাদকের স্বর: সাবধান! চৈত্রমাসে নগরে গুটিকা-

রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে—রাজপুরুষের আজ্ঞা এই যে—

মিড্ শট্।

পটহ বাদক প্রমোদ উদ্যানের পার্শ্বের পথ দিয়া চলিয়াছে। তাহার বক্ষের উপর কণ্ঠসংলগ্ন পটহ ঝুলিতেছে। দুই হস্তে পটহ দণ্ড। কয়েকজন কৌতূহলী পথচারী তাহার পশ্চাৎ চলিয়াছে।

পটহ বাদক: যে কোনও নাগরিক-নাগরিকা গুটিকা রোগে আক্রান্ত হবে, তাকে তৎক্ষণাৎ নগর বাহিরে পরিখার অপর পারে নিক্ষেপ করা হবে।—রোগ সংক্রামক।

ক্লোজ শট্।

নৃত্যপর যুবক যুবতীগণ দাঁড়াইয়া শুনিতেছে।

পটহ বাদকের স্বর: নগরবাসিগণ, সাবধান!

পটহের শব্দ হইল। যুবক যুবতীগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল। তারপর তাচ্ছল্যসূচক উচ্চ হাসিয়া আবার নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

ডিজল্ভ্।

লং শট্।

দিন। মথুরার একটি পথ। লোক চলাচল অল্প। চারিজন বাহক একটি মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেল। পথচারিগণ স্পর্শ বাঁচাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

মিড্ লং শট্।

ঐ পথ। পাশের একটি বাড়ী হইতে একটি জীবন্ত বসন্ত রোগীকে কয়েকজন লোক ধরাধরি করিয়া বাহির করিল। রোগী কাতরোক্তি করিতেছে। তাহাকে চালির উপর শোয়াইয়া বাহকগণ তুলিবার উদ্যোগ করিল।

ডিজল্‌ভ্।

মিড লং শট্।

পথের উপর একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখভাগ। প্রবেশ দ্বারের উপরে ব্যাল্‌কনি।

রুদ্ধ প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে চার-পাঁচজন বিলাসী যুবক সমবেত হইয়াছে। তাহারা দ্বারে ধাক্কা দিতেছে।

মিড্ ক্লোজ শট্।

দ্বারের সম্মুখে যুবকগণ। একজন ধাক্কা দিতেছে।

১ঃ দোর খোলো! দোর খোলো! (সকলের দিকে ফিরিয়া) এ কী! আজ হ'ল কী?

২ঃ আজ মদনোৎব, আর আজই বাসবদত্তার দোর বন্ধ। অ্যাঁ। কালে কালে হল কি!

৩ঃ আরো জোরে ধাক্কা লাগাও—

মিড্ শট্।

ঐ দৃশ্য। উপরের ব্যাল্‌কনি দেখা যাইতেছে। সম্মুখে যুবকগণ ধাক্কা দিয়া চীৎকার করিতেছে। উপরে ব্যাল্‌কনিতে দাসী প্রবেশ করিল। দাসীর মুখ ভয়-বিকৃত, অঙ্গে বেশভূষা নাই। দাসী নিম্নে চাহিল।

দাসী : কে—?

যুবকগণ পিছু হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

ক্লোজ্ শট্ সম্মুখ হইতে।

যুবকগণ উর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছে।

২ : এই যে! এতক্ষণে কিঙ্করী ঠাকরুণ দেখা দিয়েছেন!

১ : কি—ব্যাপার কি? আজ্ কি সারাক্ষণ আমরা দরজাতে ধাক্কা মারব?

ক্লোজ শট্।

ব্যাল্‌কনির উপর দাসী। সে দুই হস্ত পরস্পর মর্দ্দিত করিয়া ভয় ও ব্যাকুলতা ব্যক্ত করিল।

দাসী : আর্য্যা গৃহে নাই—

ক্লোজ শট্।

উর্দ্ধমুখ যুবকগণ। সকলের মুখ ব্যাদিত হইল।

১ : গৃহে নাই! গেল কোথায়?

মিড্ ক্লোজ শট্।

দাসী শঙ্কিতচক্ষে সম্মুখে দূর সমান্তরালে চাহিল। তার পর দৃষ্টি নত করিয়া স্খলিতস্বরে কহিল—

দাসী : ঐখানে নগর পরিখার বাইরে……

দাসী সম্মুখে করাঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

ক্লোজ শট্।

যুবকগণ দৃষ্টি নামাইয়া পরস্পর তাকাইল; তারপর যেন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছে এমনিভাবে সভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইল।

লং শট্।

বাসবদত্তার গৃহসম্মুখ হইতে যুবকগণ দ্রুত প্রস্থান করিতেছে।

ডিজল্ভ্।

বাঁশী বাজিতেছে। মৃদু আবহ যন্ত্রসঙ্গীত।

আকাশের শট্।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

লং শট্।

একটি চন্দ্রালোকিত দীর্ঘ বীথি-পথ। কোকিল ডাকিতেছে। পথ নির্জ্জন। দূরাগত উৎসবের শব্দ।

পথের অপর প্রান্তে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তাহার হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু; ভিক্ষুর বেশ।

মিড্ শট্।

ভিক্ষু উপগুপ্ত: উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাঁহার মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি সম্মুখে চাহিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছেন। দূরাগত উৎসবের শব্দ।

ডিজল্ভ্।

মিড্ শট্।

রাত্রি। মথুরার সিংহদ্বার—নগরীর অভ্যন্তর হইতে। মুক্ত তোরণ পথের ভিতর দিয়া বাহিরের আম্র-কানন দেখা যাইতেছে। দ্বারে প্রতিহার নাই। নিঃশব্দ।

উপগুপ্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিঠ ক্যামেরার দিকে। তিনি তোরণ পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন।

ক্যামেরা সম্মুখে কিছুদূর ট্র্যাক করিল।

তোরণের ভিতর দিয়া আম্রকানন আরও নিকটেই দেখা গেল।

মিড্ লং শট্।

আম্র-কানন। তোরণ দ্বারের বাহির হইতে।

উপরে চন্দ্রালোক, ভিতরে অন্ধকার।

করুণ অথচ দ্রুত আবহ যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ হইল।

মিড্ শট্।

আম্র কাননের অভ্যন্তর। চারিদিকে তরুচ্ছায়ার অন্ধকার; মধ্যস্থলে কিছুস্থান চন্দ্রকরে আলোকিত। ঐ স্থানে বাসবদত্তা পড়িয়া আছে। তাহার শয়নের ভঙ্গী পূর্ব্ব দৃশ্যে ভিক্ষু উপগুপ্তের শয়নভঙ্গীর স্মারক। বাসবদত্তা মাঝে মাঝে হস্ত উৎক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে।

ক্ষীণ কাতরোক্তি। আবহসঙ্গীত চলিতেছে।

ক্লোজ্ আপ্।

ভূলুণ্ঠিতা বাসবদত্তা। তাহার মুখ ও দেহ বসন্তের গুটিকায় ভরিয়া গিয়াছে। সে বাহুতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পড়িয়া গেল।

বাসবদত্তা : (ক্ষীণ স্বরে) জল—জল—

পশ্চাৎ হইতে উপগুপ্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কটি পর্য্যন্ত নিম্নাঙ্গ ও হস্তধৃত দণ্ড কমণ্ডলু দেখা গেল।

বাসবদত্তা ভিক্ষুর আগমন জানিতে পারিল না।

আবহসঙ্গীত চলিতেছে।

ক্লোজ শট্।

উপগুপ্ত ও বাসবদত্তা।

উপগুপ্ত বাসবদত্তার শিয়রে বসিলেন ও তাহার আড়ষ্ট শির সযত্নে নিজ অঙ্গে তুলিয়া লইলেন। বাসবদত্তা ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিল।

উপগুপ্ত : জল পান কর বাসবদত্তা—

উপগুপ্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু তাহার মুখে ধরিলেন।

ক্লোজ আপ্।

বাসবদত্তা জল পান করিতেছে। উপগুপ্ত সস্নেহে তাহার মস্তকে ডান হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তাঁহার অধরোষ্ঠ নড়িতেছে; যেন তিনি অস্ফুটস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বাসবদত্তা জলপান শেষ করিল। তাহার মস্তক আবার ভিক্ষুর ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল।

ক্লোজ শট্।

কমণ্ডলু রাখিয়া ভিক্ষু নিজ বস্ত্রান্তরাল হইতে চন্দনপঙ্ক বাহির করিয়া বাসবদত্তার মুখে হস্তে লেপিয়া দিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা স্থির অপলক নেত্রে ভিক্ষুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বাসবদত্তা : (স্খলিতস্বরে) কে তুমি দয়াময় ?

ক্লোজ আপ্।

ভিক্ষু ও বাসবদত্তার মুখ।

ভিক্ষু স্নিগ্ধ সহাস্য দৃষ্টিতে বাসবদত্তার পানে চাহিয়া আছেন।

উপগুপ্ত : আমি ভিক্ষু উপগুপ্ত। বলেছিলাম, সময় হলে আসব, তাই আজ তোমার কুঞ্জে এসেছি বাসবদত্তা—

ভিক্ষু গম্ভীর মুখে বাসবদত্তার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিলেন।

ক্লোজ শট্।

ভিক্ষু বৈরাগ্যপূর্ণ গভীর উদাত্তকণ্ঠে বলিলেন—

উপগুপ্ত : বল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি

বাসবদত্তা : (কম্পিতস্বরে) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ফেড্ আউট্।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬